বিশ্ব ইতিহাস

(১৭৬৩—১৯৪৯)

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন সিলেবাস অনুযায়ী প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর জন্য লিখিত)

অধ্যাপক নির্মলকান্তি মল্লিক চৌধুরী
এম. এ (ইতিহাস) ; এম. এ (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ;
এম. এ. (ইস্লামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)।

গ্লোব বুক এজেন্সী
৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯।

প্রকাশক
শ্যামল চৌধুরী
গ্লোব বুক এজেন্সী
৩; কলেজ রো
কলিকাতা—৯।

প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৬০।

মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রচ্ছদপট ও চিত্রশিল্পী
অমূল্য দাস

মুদ্রাকর
শ্রীমহাদেব মণ্ডল
ন্যাশন্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ১৭৬৩ খৃঃ হইতে ১৯৪৯ খৃঃ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস প্রাক্—বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পাঠ্য নির্ধারিত করিয়াছেন। অর্থাৎ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধি হইতে অতি আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সুবিস্তৃত এবং বিশাল পাঠ্যক্রম অনুযায়ী গ্রন্থ রচনার সুযোগ নাই। কারণ এই ঘটনাবহুল ইতিহাসের নম্বর হইল মাত্র একশত এবং এক বৎসরের পাঠ্যক্রম হইলেও পঠন-পাঠনের সময় পাঁচ মাসের অধিক হইবে না।

বর্তমান বিশ্ব ইতিহাস বস্তুতঃপক্ষে ইউরোপের ইতিহাসেরই বৃহত্তর রূপ। এমনকি চীন ও জাপান, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির ইতিহাস ইউরোপের শক্তিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সংগ্রামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভৌগলিক আবিষ্কার, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, পোল্যাণ্ড বিভাগ, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ন, ভিয়েনা সম্মেলন, তৃতীয় নেপোলিয়ন পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস, জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য, প্রাচ্যসমস্যা, শিল্পবিপ্লব, ১৮৭৮ খৃঃ হইতে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাম্রাজ্যবাদ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানের ইতিহাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তুরস্ক ও কামালপাশা, আরব জাতীয়তাবাদ, রুশ বিপ্লব, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আজিকার পৃথিবী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ১৭৬৩ খৃঃ হইতে ১৯৪৯ খৃঃ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল ঘটনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় ঘটনাবলী বাদ দিতে হইয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনা করিতে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের উল্লেখযোগ্য একান্ত প্রয়োজনীয় সকল গ্রন্থগুলির সাহায্য লইয়াছি। ঐতিহাসিকদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ঘটনার গুরুত্ব বুঝাইবার এবং আলোচনা সর্বত্র সহজ, সরল এবং

হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যাহাতে গ্রন্থখানি তথ্যবহুল হইলেও সুখপাঠ্য হয়। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ হইতে সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দান সম্ভব হইবে। আশাকরি গ্রন্থখানি বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাগণের সমাদর লাভ করিবে।

ইতস্ততঃ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ত রহিয়া গেল। পরবর্তী সংস্করণে ঐগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

২০শে জুলাই ১৯৬০।
৪এ রাজা লেন, কলিকাতা-৯।

ইতি—
নির্মলকান্তি মল্লিক চৌধুরী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

মানচিত্র

বিশ্ব ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপ ও পৃথিবী

প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসের ধারা ঃ ১৭৬৩ খৃঃ হইতে আমাদের আলোচনা স্থরু হইবার কথা। ১৭৬৩ খৃঃ প্যারিসের সন্ধি দ্বারা সপ্তবর্ষের যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগের ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে ইউরোপের ইতিহাসের ধারা আলোচনা করা প্রয়োজন।

খৃষ্টের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্বে গ্রীসদেশে যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, গ্রীকদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিনষ্ট হইবার পর এই গ্রীক সভ্যতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া সমৃদ্ধ রোমান সভ্যতা ও শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যখন রোমান সাম্রাজ্যের পতন হইল তখন ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইল। সমগ্র ইউরোপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এইভাবে তিনশত বৎসর অতিবাহিত হইবার পর জার্মান জাতির এক শাখার রাজা শার্লামেন পুনরায় ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা তাহার জীবিতকালেই মাত্র বজায় ছিল। কারণ তাহার উত্তরাধিকারীগণের রাজত্বকালে সময় সময় সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিলেও সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছিল। ইউরোপের বুকে নামিয়া আসিয়াছিল অরাজকতা, বিশৃংখলা ও কুসংস্কারের অভিশাপ। এই সময়কে বলা হয় অন্ধকার যুগ (Dark Age)

ইউরোপের অন্ধকার যুগ

ইউরোপ যখন ধীরে ধীরে এই অন্ধকার যুগ অতিক্রম করিতেছিল তখন আরবদেশে ইসলামী সভ্যতা ক্রমবিকাশমান। খলিফাদের নেতৃত্বে চীন সীমান্ত

হইতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়াছিল। মুসলমানদের আক্রমণে ইউরোপ ও এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড বিধ্বস্ত হইলেও ইউরোপের উপর সতেজ ইসলামী সভ্যতার আলোকপাত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে খৃষ্টানদের পবিত্র জেরুজালেমকে কেন্দ্র করিয়া খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড আরম্ভ হইয়াছিল। এই ধর্মযুদ্ধের আঘাতে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন স্পন্দনের সূচনা হইয়াছিল।

ইসলামের বিকাশ

প্রাচীন কালে গ্রীস এবং রোমের সহিত ভারতের সরাসরি বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগে আরব বণিকদের আধিপত্য বিস্তারের কালে এই যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। প্রাচ্যদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আরবদের হস্তগত হয়। আরব বণিকগণ ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মসলা ও বহুপ্রকার মূল্যবান সামগ্রী ইটালীর ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করিত। কিন্তু ইউরোপের বণিকগণ আরবদের নিকট হইতে প্রাচ্যের বাণিজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পর্তুগীজ ও স্পেনীয় বণিকগণ এই বিষয়ে অগ্রণী হইল।

প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপে যে রেণেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল তাহার ফলে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত হইল যুগান্তকারী পরিবর্তন। ১৪৫৩ খৃঃ তুর্কীদের আক্রমণের ফলে কনষ্টান্টিনোপলের পতন হইল এবং কনষ্টান্টিনোপল শক্তিশালী অটোম্যান সাম্রাজ্যের (তুর্ক সাম্রাজ্য) অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার ফলে গ্রীক মনীষীগণ পলাইয়া ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সকল মনীষীগণ নবজাগরণের আন্দোলনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিলেন। ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে পুরাণো বাণিজ্যপথগুলি তুর্কীদের হস্তগত হইলে, ইউরোপীয় বণিকগণ নূতন বাণিজ্যপথ আবিষ্কারে সচেষ্ট হইল। ফলে একাধিক বাণিজ্যপথ ও নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইল এবং ইউরোপের জাতিগুলি বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রসর হইল।

কনষ্টান্টিনোপল পতনের ফল

রেণেসাঁসের ঢেউ শুধুমাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও ইহার ধারা অব্যাহত ছিল। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপের জনসাধারণ অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইটালীর বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল এবং টিটিয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাস প্রমাণ করিলেন যে পৃথিবী সৌর জগতের মধ্যস্থলে নহে—পৃথিবী একটি গ্রহ, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কেপলার এবং গ্যালিলিও এই মতবাদকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রাণসিস বেকণের নামও উল্লেখযোগ্য। ইটালীর দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাসিও, ইংলণ্ডের চসার, স্পেনের সার্ভেন্টিস এবং ফ্রান্সের রেবেলাই নিজ নিজ দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। মুদ্রণ যন্ত্র, বারুদ এবং নাবিকগণের দিক-নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস আবিষ্কৃত হইবার ফলে বাণিজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল।

রেণেসাঁস ও ইউরোপের উন্নতি

বারুদ আবিষ্কৃত হইবার ফলে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া গেল এবং শক্তিশালী জাতীয় রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হইল। পূর্বে রাজাকে সৈন্য-বাহিনী গঠনের জন্য অভিজাতদের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু বারুদ আবিষ্কৃত হইবার ফলে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গেল এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। ফলে রাজা অভিজাতদের ক্ষমতা হস্তগত করিয়া শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইলেন। প্রাচীন যুগের ইউরোপের বিরাট সাম্রাজ্য বিস্তারের আদর্শ পরিত্যক্ত হইল এবং একাধিক স্বাধীন রাজ্য ও জাতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যবসা বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি হইবার ফলে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত ও বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল। ক্রমে ক্রমে ইহারা অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজক্ষমতা খর্ব করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপনে অগ্রসর হইল।

জাতীয় রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়

ভৌগোলিক আবিষ্কার ঃ পূর্বে প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য মুখ্যতঃ ইটালীর ভেনিস এবং জেনোয়ার নাবিকদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলি ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রাচ্যের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য নূতন বাণিজ্য পথ আবিষ্কারে অগ্রসর হইল। রেণেসাঁসের ফলে ইউরোপের জাতিগুলির মধ্যে যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল তাহাও দুঃসাহসিক নাবিকদের সমুদ্রপারের দেশগুলিতে অভিযানে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ১৪৫৩ খৃঃ তুর্কীদের হস্তে কনষ্টান্টিনোপলের পতন হইলে প্রাচীন সামুদ্রিক বাণিজ্য-পথগুলি ইউরোপীয় বণিকদের নিকট রুদ্ধ হইল। সুতরাং তাহারা নূতন বাণিজ্যপথ আবিষ্কারে অগ্রসর হইল। স্পেন এবং পর্তুগালের নাবিকগণই এ বিষয়ে অগ্রণী হইল।

মার্কোপোলো

১৪৫৩ খৃঃ কনষ্টান্টিনোপলের পতনের বহু পূর্বে ভিনিসীয় পর্যটক মার্কোপোলো (১২৭১-৯৫) এশিয়ার বিভিন্ন অংশ পরি-ভ্রমণ করিয়া এক মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছিলেন। আবিষ্কারের অভিযানে পর্তুগালের রাজকুমার "নাবিক হেনরী"র নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার উৎসাহ এবং পৃষ্টপোষকতায় পর্তুগীজ নাবিকগণ বারংবার অভিযান করিয়া আফ্রিকার অনেক অজানা অংশ আবিষ্কার করে।

রাজকুমার হেনরী

১৪৮৬ খৃঃ বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া সুদূর দক্ষিণ অন্তরীপে উপনীত হন। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এই স্থানের নাম দেন 'ঝটিকা অন্তরীপ'। কিন্তু ১৪৯৮ খৃঃ আর একজন পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা এই পথ ধরিয়া দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে উপনীত হন। ভাস্কো-ডা-গামা ঝটিকা অন্তরীপের নামকরণ করেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope)।

বার্থলোমিউ দিয়াজ

ভাস্কো-ডা-গামা

ইতিমধ্যে স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড এবং রানী ইসাবেলার সহায়তায় ইটালীর জেনোয়া নিবাসী নাবিক কলম্বাস ১৪৯২ খৃঃ ভারত ও প্রাচ্যের পথ আবিষ্কারে অগ্রসর হইয়া ভুলক্রমে এক নূতন মহাদেশ আবিষ্কার

করিলেন। কলম্বাস জানিতেন না যে ইহাই আমেরিকা। তিনি মনে করেন এই নূতন দেশ হইল 'ইণ্ডিজ', বা ভারত এবং এখানকার অধিবাসীদের তিনি নামকরণ করেন 'লাল ভারতীয়'। ১৪৯৭ খৃঃ ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী কর্তৃক নিযুক্ত ভিনিসীয় নাবিক সিবাস্তিয়ান ক্যাবট আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে উপনীত হন। ১৫০৩ খৃঃ ফ্লোরেন্স নিবাসী নাবিক আমেরিগো ভেসপুক্কি আমেরিকায় পদার্পণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনরাজ পঞ্চম চার্লসের সহায়তায় পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলান (১৫১৯-২২ খৃঃ) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। ১৫২২ খৃঃ তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫০০ খৃঃ কলম্বাসের জনৈক পর্তুগীজ সঙ্গী ভিসেণ্ট পিনজন ব্রেজিল আবিষ্কার করেন। ম্যাগেলানের পর একজন স্প্যানিশ সেনাপতি হারনান্ডো কোর্তে মেক্সিকো এবং তাহার পরই পর্তুগীজ নাবিক পিজারো পেরু আবিষ্কার করেন। আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশ স্থাপিত হইল। নব আবিষ্কৃত দেশসমূহের অধিকার লইয়া বিরোধ সৃষ্টি হইবার ফলে পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার মধ্যস্থতা করিয়া পৃথিবীকে দুইভাগ করিয়া একভাগে স্পেন ও অপরভাগে পর্তুগালকে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের অধিকার দিলেন। কিন্তু অপরাপর ইউরোপীয় দেশগুলি এই বণ্টন ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য প্রতিযোগিতা ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইল।

কলম্বাস

ক্যাবট, ভেসপুক্কি

ম্যাগেলান

পিনজন

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা: দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা। এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল স্পেন ও পর্তুগাল। কলম্বাসের আবিষ্কারের একশত বৎসরের মধ্যে আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে স্পেন উপনিবেশ স্থাপন করিল। মেক্সিকো ও পেরুতে চাষবাস ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য স্পেনীয়গণ আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের দাসরূপে নিযুক্ত করিল। স্পেনীয়গণ এখানে সোনা ও রূপার খনির সন্ধান পাইল।

সমুদ্রপথে আবিষ্কার
ম্যাগেলান ১৫২২
দিয়াজ ১৪৮৬
উত্তমাশা অন্তরীপ
পোর্তুগাল
স্পেন
ফ্রান্স
স্কটল্যাণ্ড
কলম্বাস ১৪৯২
ব্রাজিল
আফ্রিকা
ম্যাগেলান
মালিন্দ
জাঞ্জিবার
ফিলিপাইন

লোভী ও নিষ্ঠুর স্পেনীয় বণিকগণের অকথ্য অত্যাচারে দুর্বল আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। খৃষ্টান ধর্ম-যাজকগণ পর্যন্ত রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্রীতদাসে পরিণত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। লুণ্ঠিত এই সম্পদের জোরে স্পেন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। কিন্তু ঈর্ষান্বিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে স্পেনের একচেটিয়া অধিকার বিপন্ন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আসিয়া আমেরিকায় স্পেনের সহিত ভাগ বসাইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে একদল ইংরেজ বণিক উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপন করিল—ক্রমে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ড বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করিল এবং বাণিজ্য বিস্তার করিল। ক্যানাডায় ফরাসীগণ উপনিবেশ স্থাপন করিল।

আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন

প্রাচ্যদেশের সহিত নূতন বাণিজ্য পথ আবিষ্কৃত হইবার ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলি প্রাচ্যের দেশগুলি লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল। পর্তুগীজগণ সর্বপ্রথম প্রাচ্যের মশলা ব্যবসা হস্তগত করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানেও তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু ওলন্দাজগণ ক্রমে পর্তুগীজদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি হইতে বিতাড়িত করিয়া লাভজনক মশলা ব্যবসা হস্তগত করিল। পর্তুগীজদের হস্তে ভারতের গোয়া, দমন, দিউ এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রাম ও বন্দর মাত্র রহিল। স্পেনের অধিকারে রহিল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন

শীঘ্রই ইংরেজ ও ফরাসীগণ প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইল। কিন্তু নৌবলে বলীয়ান ইংরেজদের সহিত ফরাসীগণ আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ক্রমে ফরাসীগণ ভারত হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইল। ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। আরব সাগরে মরিসাস এবং ভারতে মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে মাত্র ফরাসী অধিকার বজায় রহিল। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধে

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য

সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আমেরিকায় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল।

ইউরোপে সংঘর্ষ : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ভারতে যখন ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল তখন ইউরোপে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই যুদ্ধে দুই বিবাদমান দলে যোগদান করে। ইহাই অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৭৪০ খৃঃ মহাবীর ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় রাজা ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যু হইলে তাহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ফ্রেডারিক অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত সাইলেশিয়া অধিকার করিলেন। ফ্রান্স, ব্যাভেরিয়া, স্পেন প্রভৃতি শক্তিগুলি রাষ্ট্রগুলি সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। বাধ্য হইয়া মেরিয়া থেরেসা, ফ্রেডারিককে সাইলেসিয়া প্রদান করিলেন। ফ্রেডারিক সাময়িকভাবে নিরপেক্ষ রহিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মেরিয়া থেরেসার পক্ষে যোগদান করিল। মেরিয়া থেরেসা ও ফ্রেডারিকের মধ্যে ড্রেসডেনের সন্ধি (১৭৪৫ খৃঃ) দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইল। ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া পাইলেন ; ইহার পরিবর্তে তিনি মেরিয়া থেরেসার উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ইহার পরও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৭৪৮ খৃঃ আয়েক্স-লা-স্যাপেলের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হইল। মেরিয়া থেরেসা ও তাহার স্বামী অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ

কিন্তু ১৭৫৬ খৃঃ এক কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হইল। এই কূটনৈতিক বিপ্লবের স্রষ্টা ছিলেন অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত মন্ত্রী কাউনিজ। মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরাধিকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কাউনিজ ফ্রান্সের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিলেন। এই নূতন শক্তি

কূটনৈতিক বিপ্লব

জোট গঠনে এবং ইউরোপের বাহিরে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়ায়—আতংকিত ইংলণ্ড, প্রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল। এই নূতন শক্তি বিন্যাস ইউরোপকে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। মেরিয়া থেরেসা রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী জারিনার সমর্থন লাভ করিলেন। এই যুদ্ধ ইউরোপের বাহিরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের জয়লাভ এবং বন্দিবাসের যুদ্ধে স্যার আয়ার কূটের হস্তে ফরাসীদের পরাজয়ের ফলে ভারতে ফরাসী উপনিবেশ বিস্তারের আশা বিলীন হইল। কুইবেকের যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে ফ্রান্স কানাডা হইতে বিতাড়িত হইল। অবশেষে ১৭৬৩ খৃঃ প্যারিসের সন্ধি দ্বারা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইল। এই

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ
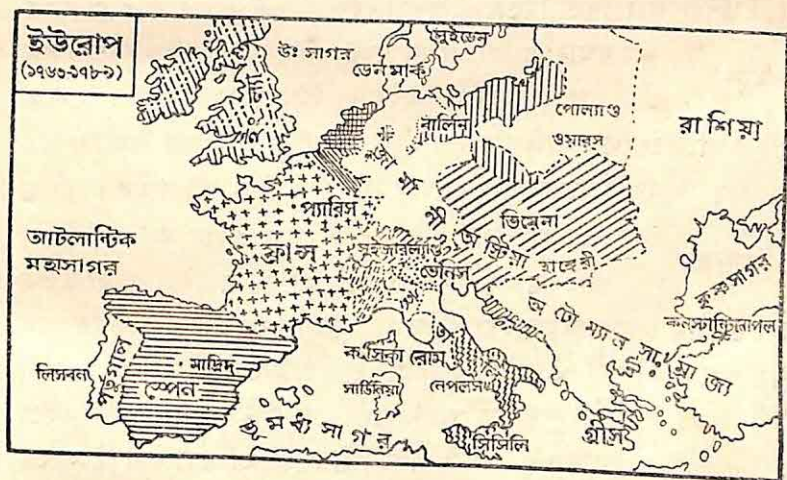
সন্ধির সর্তানুযায়ী ফ্রান্স কানাডা, নোভাস্কোটিয়া, কেপব্রিটন ; গ্রেনাজা, টোবাগো, ডোমিনিকা এবং সেণ্ট ভিন্সেণ্ট প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলি

ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। আফ্রিকায় গোরী ফ্রান্সের হস্তে রহিল কিন্তু সেনেগাল ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ভারতের ফরাসী উপনিবেশগুলি ফ্রান্সকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ইউরোপে ইংলণ্ড বেলিদ্বীপের পরিবর্তে মিনর্কা ফিরিয়া পাইল। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হুবার্টবার্গের সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়া সাইলেসিয়ায় প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইহার পরিবর্তে ফ্রেডারিক স্যাক্সনি পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল : ইউরোপের শক্তিগুলির অবস্থা : সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইউরোপের রাজনীতির ধারা পাল্‌টাইয়া গেল। প্রাশিয়া একটি বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। প্রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধিতে অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল—কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হইল এবং ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। জার্মানীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর প্রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের সূচনা হইল।

প্রাশিয়া

এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের সম্মান ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইল। একাধিক উপনিবেশ তাহার হস্তচ্যুত হইল। ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে ফ্রান্সের আধিপত্য লুপ্ত হইল।

ফ্রান্স

অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার নিকট হইতে সাইলেসিয়া পুনরধিকারের জন্য সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইলেসিয়া প্রাশিয়াকে প্রদান করিতে হইল। অধিকন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হইয়া পড়িল। অষ্ট্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়িবার ফলে পরবর্তীকালে জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল।

অস্ট্রিয়া

স্পেন এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করায় দুর্বল হইয়া পড়িল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও ফ্লোরিডা ইংলণ্ডের হস্তগত হইল।

স্পেন

শুধু ইউরোপ নয়, এই যুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমেরিকা ও ভারতে উপনিবেশ বিস্তারের সংগ্রামে ফ্রান্স ইংলণ্ডের নিকট

পরাজিত হইল। ভারত ও আমেরিকায় ফরাসী প্রভাব প্রায় লুপ্ত হইল। ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ও উপনিবেশ স্থাপনকারী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। অপরিমিত নৌশক্তির অধিকারী ইংলণ্ড ভারত ও আমেরিকায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইল। ইংলণ্ড কর্তৃক কানাডা বিজয়ের ফলে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। কারন ফরাসীদের শাসন মুক্ত জনসাধারণের নিকট ইংরেজ শাসন অসহ্য হইয়াছিল।

ভারত ও আমেরিকায় ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন

পোল্যাণ্ড বিভাগ ঃ ইউরোপের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় ঘটনা হইতেছে পোল্যাণ্ডের বিভাগ। ষোড়শ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র। সে ছিল তুরস্কের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হইতে ইউরোপের রক্ষাকর্তা। জন সবিস্কির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডের সৌভাগ্য সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে বিরাজ করিতেছিল। তিনি তুর্কীদের আক্রমণ হইতে ভিয়েনা রক্ষা করিয়া ইউরোপের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হয় এবং ক্রমশঃ পোল্যাণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বৈদেশিক শক্তিগুলির সম্প্রসারণবাদী নীতির ফলে পোল্যাণ্ডের পতন হয়। পোল্যাণ্ডে নির্বাচিত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং নির্বাচনের সময় বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এবং চক্রান্তের সৃষ্টি হইত। রাজা, নির্বাচিত হইবার জন্য অভিজাতদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতেন। পোল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট 'ডায়েট'এ অভিজাতদের প্রাধান্য ছিল। সুতরাং অভিজাতগণই আসল ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ইহা ব্যতীত পোল্যাণ্ডের সংবিধান ছিল বিচিত্র। পার্লামেণ্টের একজন সদস্যও কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিলে তাহা বাতিল হইয়া যাইত। ফলে দেশের কোন উন্নতি সম্ভব ছিল না। পোল্যাণ্ডে সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। চাষী সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ সামন্তদের হস্তে নিপীড়িত হইত। পোল্যাণ্ডে কোন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় না থাকায় উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। ফলে সামাজিক ঐক্য গড়িয়া উঠে নাই। তদুপরি পোল্যাণ্ডের কোন ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না। সমস্ত দেশ তিনটি পৃথক

পোল্যাণ্ডের অবস্থা

অংশে বিভক্ত ছিল। সীমান্তে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়ার ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্র থাকায় পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব বিপদগ্রস্থ হইয়াছিল।
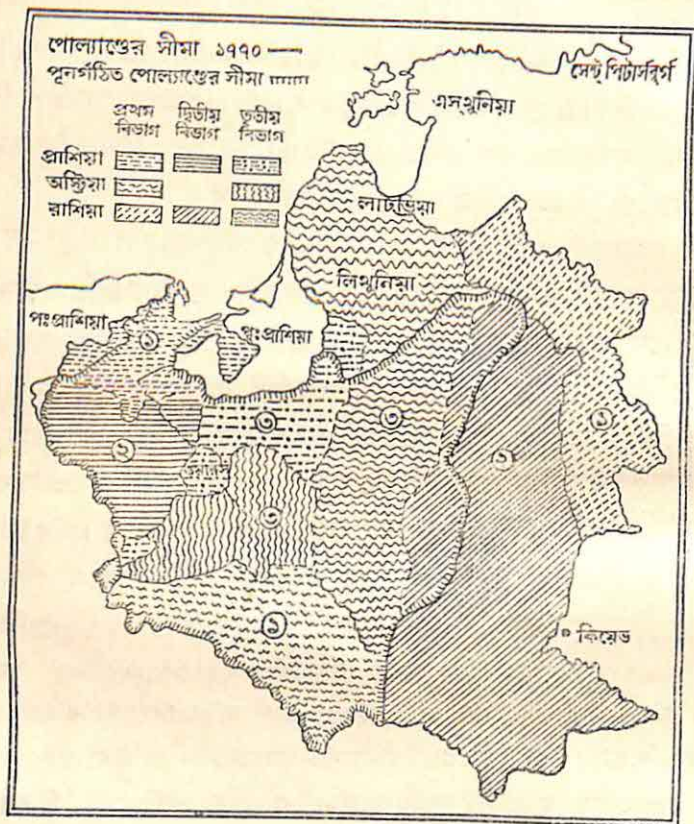
অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের পর মহাবীর ফ্রেডারিক প্রাশিয়াকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। দুর্বল পোল্যাণ্ডকে রাশিয়া সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু ফ্রেডারিক রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া পোল্যাণ্ডের বিভাগ দাবী করিলেন। অষ্ট্রিয়াও ভাগাভাগিতে যোগদান করিল। ১৭৬৩ খৃঃ ক্যাথরিণ পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে

রাজা নির্বাচনের সুযোগ লইয়া পোল্যাণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৭৭২ খৃঃ সেণ্ট পিটার্সবার্গের সন্ধি অনুযায়ী রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া নির্লজভাবে পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশ আত্মসাৎ করিল। ১৭৯৩ খৃঃ এক গোপন চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া এবং প্রাশিয়া দ্বিতীয়বার পোল্যাণ্ড ভাগ করিয়া করিয়া লইল। ১৭৯৫ খৃঃ পোল্যাণ্ডের বাকী অংশটুকু রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইল। পোল্যাণ্ড ইউরোপের মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পোল্যাণ্ড বিভাগের মূলে ছিল বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির উগ্র সাম্রাজ্যবাদী কামনা। ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই। ঐতিহাসিক গুয়েডালা মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা হইল "most shameless and barren act of European diplomacy".

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ

১৪৫৩ তুর্কীদের কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার।

১৪৮৬ বার্থলোমিউ দিয়াজ কর্তৃক আফ্রিকার ঝটিকা বা উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার।

১৪৯২ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।

১৪৯৮ ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকটে উপনীত।

১৫১৯-২২ ম্যাগেলানের ফিলিপাইন আবিষ্কার ও সমুদ্রপথে ভূ-প্রদক্ষিণ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্য বিস্তার।

১৭৪০-৪৮ অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ।

১৭৪৫ ড্রেসডেনের সন্ধি।

১৭৪৮ আয়েক্স-লা-স্যাপেলের সন্ধি।

১৭৪৮-৫৬ কূটনৈতিক বিপ্লব।

১৭৫৬ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ।

১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬৩ হুবার্টস্‌বার্গের সন্ধি।

১৭৬৩ প্যারিসের সন্ধি।

১৭৭২ পোল্যাণ্ডের প্রথম বিভাগ।

১৭৯৩ " দ্বিতীয় " ।

১৭৯৫ " তৃতীয় " ।

সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এইজন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্য করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাতে উপনিবেশগুলিতে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। ইতিপূর্বে ঔপনিবেশিকদের বাণিজ্যের উপর ইংলণ্ড বহু বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিল। ইংলণ্ড উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল সংগ্রহের স্থান এবং নিজের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার বলিয়া মনে করিত। ইতিপূর্বে ন্যাভিগেশন এ্যাক্ট পাশ করিয়া ইংলণ্ড নিয়ম করিয়াছিল যে ঔপনিবেশিকগণ সরাসরি কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিবে না এবং কোন বিদেশী সামগ্রী আমদানী করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইত উপনিবেশে তাহা উৎপাদন করা নিষিদ্ধ ছিল। তূলা এবং তামাক ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ ছিল। সেইজন্য উপনিবেশগুলির অধিবাসীগণ ইংলণ্ডের উপর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ১৭৬৫ খৃঃ লর্ড গ্রেনভিল যখন ষ্ট্যাম্পএ্যাক্ট প্রবর্তন করিলেন তখন এই বিরোধ ব্যাপক আকার ধারণ করিল। এই আইনে বলা হইল যে সমস্ত দলিলপত্র, সংবাদপত্র, লাইসেন্স প্রভৃতির উপর সরকারী টিকিট লাগাইতে হইবে এবং ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইংলণ্ডের কোষাগারে যাইবে। উদ্দেশ্য ছিল এই অর্থ আমেরিকায় অবস্থিত ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী পোষণের জন্য ব্যয়িত হইবে। স্বভাবতঃই ঔপনিবেশিকগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল এবং তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। তাহারা দাবী করিল যে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে যখন তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই তখন তাহাদের উপর কর ধার্য করিবার অধিকারও পার্লামেণ্টের নাই। ইংলণ্ডে বার্ক, ফক্স প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কঠোর ভাষায় কর ধার্য অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া সমালোচনা করিলেন এবং উপনিবেশগুলির সহিত আপোষ মীমাংসার পরামর্শ দিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ রকিংহাম প্রধান মন্ত্রী হইয়া আসিলেন এবং তিনি ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতে বিরোধ মিটিল না। এই এ্যাক্ট প্রত্যাহার করিলেও পার্লামেণ্ট দাবী করিল উপনিবেশের উপর কর ধার্য করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে।

ন্যাভিগেশন এ্যাক্ট

ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট

ইহার দুই বৎসর পরই চ্যাথাম মন্ত্রিসভার সদস্য অর্থমন্ত্রী টাউনসেণ্ড চা, কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি কয়েকটি আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিলেন। ইহাতে ঔপনিবেশিকগণের অসন্তোষ আরও বাড়িয়া গেল। ১৭৭০ খৃঃ বোষ্টন বন্দরে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করিবার ফলে ১৭৭০খৃঃ লর্ড নর্থের মন্ত্রিসভা চা' ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যগুলির উপর হইতে শুল্ক প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু ইহাতে আমেরিকাবাসীগণ সন্তুষ্ট হইল না।

টাউনসেণ্ড কর্তৃক শুল্ক প্রবর্তন

১৭৭৩ খৃঃ একদল স্বদেশপ্রেমিক আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে বোষ্টন বন্দরে একখানি চা বোঝাই জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চায়ের বস্তা সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিল। আন্দোলন দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমনমূলক নীতি অবলম্বন করিলেন। বোষ্টন বন্দরের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং ম্যাসাচুসেটস্‌এর স্বায়ত্ত্ব-শাসনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। বোষ্টনে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইল। ফলে আরম্ভ হইল প্রকাশ্য সংঘর্ষ।

বোষ্টনের ঘটনা

যুদ্ধ : ১৭৭৫ খৃঃ বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া সহরে সমবেত হইয়া তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার দাবী করিল এবং ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ১৭৭৫ খৃঃ লেক্সিংটন সহরে ইংরেজ সৈন্য ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে গুলি বিনিময় হইল। ফলে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল।

১৭৭৬ খৃঃ জর্জিয়া ব্যতীত বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া শহরে সমবেত হইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে (Declaration of Independence)। জর্জওয়াশিংটন ঔপনিবেশিকগণের নেতা ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন

অসাধারণ চরিত্রবল, দুর্জয় সাহস ও স্বদেশপ্রেমের অধিকারী ওয়াশিংটন অদম্য উৎসাহ লইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধের প্রথম বৎসরে সুগঠিত ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমেরিকানগণ সুবিধা করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৭৭৭ খৃঃ হইতে তাহারা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিতে থাকে। সারাটোগা ও ইয়র্ক টাউনের যুদ্ধে ইংরেজগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্স আমেরিকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। পূর্ব বিপর্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে যোগদান করিল। স্পেন ও হল্যাণ্ড ফ্রান্সের
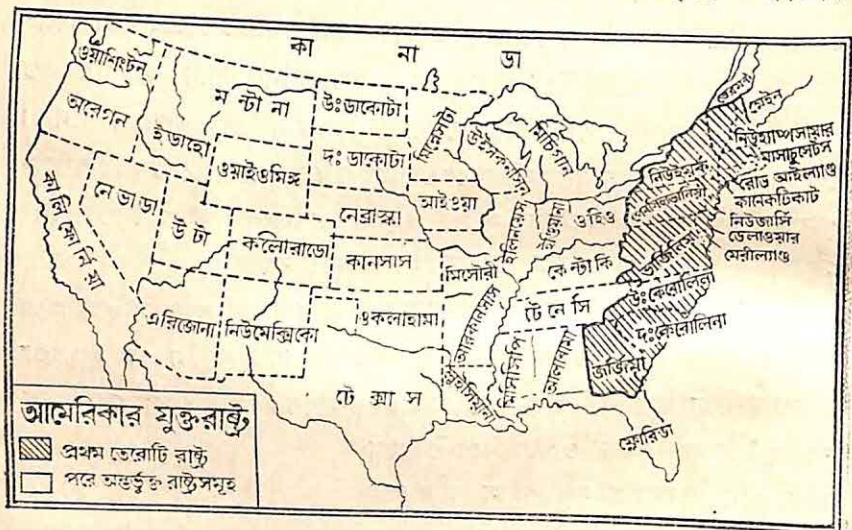
পদাংক অনুসরণ করিল। জলে স্থলে ইংলণ্ড বিপদের সম্মুখীন হইল। ফ্রান্সের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যে উৎসাহিত আমেরিকানদের হস্তে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ইয়র্ক টাউনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ভার্সাইয়ের সন্ধি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

বারংবার পরাজিত ইংলণ্ড সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। ১৭৮৩ খৃঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। তেরোটি উপনিবেশের সম্মিলনে গড়িয়া উঠিল স্বাধীন আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র। এই নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি হইলেন জর্জ-ওয়াশিংটন।

ফলাফল ও গুরুত্ব: আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ব হইতেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল। আমেরিকাকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করিবার ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইহা ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিল। ইউরোপের জনসাধারণ আমেরিকার অধিবাসীদের ন্যায় রাষ্ট্র-কাঠামো ও গণতন্ত্রের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। আমেরিকার জনসাধারণের 'ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা পত্র' সমগ্র ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে নবচেতনার সঞ্চার করিল। বস্তুতঃ পক্ষে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ফরাসী বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রচণ্ড বিপ্লবের আঘাতে শুধু যে প্রাচীন রাষ্ট্রকাঠামো এবং ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গেল তাহাই নহে, মানুষের চিন্তা জগতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। "ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ইতিহাস একটি মাত্র দেশ, একটি মাত্র ঘটনা এবং একটিমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল। দেশ হইল ফ্রান্স, ঘটনা হইল ফরাসী বিপ্লব এবং ব্যক্তি হইলেন নেপোলিয়ন"। ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র ফ্রান্সের ঘটনা নহে—এই বিপ্লবের আঘাতে ইউরোপের পুরানো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইউরোপ নূতন ভাবে পুনর্গঠিত হইল। পুরানো শাসন ব্যবস্থায় ছিল অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণী এবং রাজন্যবর্গের একাধিপত্য—সাধারণ মানুষ, সামন্ত শ্রেণী এবং যাজক শ্রেণীর অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষ মুক্তির সন্ধান পাইল। স্বৈরশাসন,

ধনিক ও যাজক শ্রেণীর অত্যাচার এবং অবিচারের অবসান ঘটিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য এবং মৈত্রীর আদর্শ ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিল। পুরানো ইউরোপের ধ্বংসের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিল জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ নূতন ইউরোপ।

বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপের অবস্থা : বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপে ছিল অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর একাধিপত্য। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই মুষ্টিমেয় সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। এমনকি ভেনিসের ন্যায় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইত। সুইজারল্যাণ্ডে শাসকশ্রেণীর সহিত সাধারণ মানুষের ব্যাপক বৈষম্য ছিল। সমগ্র ইউরোপে মজুর ও চাষীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, স্পেন, প্রাশিয়া, সুইডেন এবং ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে রাজা বা সম্রাট ছিলেন সর্বক্ষমতার অধিকারী। এই সকল শাসকগণ শুধু যে স্বৈর-শাসক ছিলেন তাহাই নহে, ইহারা ছিলেন অসাধু এবং দুর্নীতিগ্রস্থ। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির বলপ্রয়োগের ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন হইতেছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল না। বরং সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার করিবার জন্য সম্রাট বা রাজা সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতেন। এই নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিচয় পাওয়া যায় ফ্রেডারিক কর্তৃক সাইলেসিয়া অধিকার এবং রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড বিভাগের মধ্যে।

রাজনৈতিক অবস্থা

জার্মাণীর মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। জার্মাণী প্রায় তিনশত ষাটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফলে জার্মাণী ছিল দুর্বল। একমাত্র প্রাশিয়া, ফ্রেডারিক দি গ্রেট'এর নেতৃত্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্যাথরিণের নেতৃত্বে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতেছিল। ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করাই ছিল ক্যাথরিণের একমাত্র উদ্দেশ্য। জার্মাণীর ন্যায় ইটালীও ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। স্পেনের পূর্ব গৌরব লুপ্ত হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া

আকারে ছিল একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য। কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীদের লইয়া গঠিত অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকার উপনিবেশগুলি হস্তচ্যুত হইবার ফলে ইংলণ্ডের বিরাট ক্ষতি হইয়াছিল এবং মর্যাদা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ছোট পিটের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দ্রুত শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিয়াছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রধানতম শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল।

সামাজিক অবস্থা

ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায়ও বিরাট বৈষম্য ছিল। ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা ছিল অভিজাততন্ত্র বা মুষ্টিমেয়তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। সমাজের একদিকে ছিল যাজক ও ধনিক শ্রেণী এবং অন্যদিকে ছিল সাধারণ মানুষ। সুবিধাবাদী যাজক এবং ধনিক শ্রেণী কোন প্রকার কর প্রদান করিত না—প্রয়োজন হইলে সামান্য কর প্রদান করিত। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা করভারে নিপীড়িত হইত। ফলে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। সার্ফ বা চাষী শ্রেণী শস্য উৎপন্ন করিলেও ভূস্বামীগণই তাহার অধিকাংশ পাইত। ফলে সমাজে দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল—ধনিক শ্রেণী ও সার্ফ বা চাষী-মজুর শ্রেণী। সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হস্তগত ছিল এবং দরিদ্র সাধারণ মানুষ সর্বক্ষেত্রে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইত। সুতরাং এই অবস্থায় যে বিপ্লব সংগঠিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি !

বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থা (বিপ্লবের কারণ সমূহ) : (১) ফ্রান্সে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং রাজাই ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। জন-প্রতিনিধি মূলক সংস্থাগুলি হয় বিলুপ্ত হইয়াছিল কিংবা সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছিল। ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক পার্লামেণ্ট "ষ্টেটস্ জেনারেল" বিলুপ্ত হইয়া-ছিল। ফলে সম্রাটের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার মত কোন সংস্থা ছিল না এবং তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। তাহার কার্য ছিল নির্দেশদান করা এবং জনসাধারণের কর্তব্য ছিল সেই নির্দেশ মানিয়া চলা। এই ধরণের কেন্দ্রীভূত শাসন কার্য পরিচালনা করিতে শক্তিশালী এবং সুদক্ষ

শাসকের প্রয়োজন ছিল। সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইএর বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি যত্নবান ছিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী পঞ্চদশ লুই ছিলেন দুর্বল এবং অকর্মণ্য শাসক। ফলে শাসন ক্ষমতা, লোভী এবং অপদার্থ সভাসদবর্গের হস্তগত হইয়াছিল। তাহারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের প্রতি অধিক যত্নবান ছিল। তাহাতে শাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। বিক্ষুব্ধ ও নির্যাতিত জনসাধারণের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

স্বৈরতন্ত্রের দুর্নীতি, কুশাসন

(২) সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত ফ্রান্সের সমাজ, অবস্থা অনুযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত ছিল। মোটামুটিভাবে ফ্রান্সের জনসাধারণকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অধিকারী উচ্চ শ্রেণী এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত নিম্নশ্রেণী। ধনিক এবং উচ্চশ্রেণীর যাজকগণ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হয় তাহারা কোনপ্রকার কর প্রদান করিত না বা আংশিক কর-প্রদান করিত। চাষী, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শাসন ব্যবস্থায় তাহারা কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিল না; কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হইত। ধনিকগণ বা সামন্ত শ্রেণী ছিল দুর্নীতির পংককুণ্ড। পূর্বে তাহারা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে শাসনকার্যে সহায়তা করিত—বিনিময়ে তাহারা বিভিন্ন সুবিধা পাইত এবং কোন প্রকার কর প্রদান করিত না। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে তাহাদের আর কোন কর্তব্য ছিল না তথাপি তাহারা পূর্বের ন্যায় সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। বরং তাহারা চাষীদের দ্বারা বলপূর্বক চাষবাস করাইয়া লইত—সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদগুলিতে নিযুক্ত হইত কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের কোন কর্তব্য ছিল না। ইহার ফলে সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ধনিক শ্রেণীর ন্যায় যাজক শ্রেণীও বহুবিধ

শ্রেণীগত বৈষম্য ও বিরোধ

সামন্তশ্রেণী

সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। উচ্চ শ্রেণীর যাজকগণ ধনিক শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইত। তাহারা ছিল ক্ষমতালোভী, চক্রান্তকারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ। ধর্মীয় কর্তব্য পালনের প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। বরং নিম্নশ্রেণীর যাজকগণ যাহারা উপাসনা এবং অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিত তাহারা কোন সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল না এবং তাহাদের পদোন্নতি হইত না। সুতরাং সাধারণ মানুষের ন্যায় তাহারাও অসন্তুষ্ট ছিল এবং প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান কামনা করিত।

যাজক শ্রেণী

সামন্ত এবং যাজক শ্রেণীর নিম্নে ছিল দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ। ইহাদের তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ড ষ্টেট (Thrid Estate) বলা হইত। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, চাষী এবং শ্রমিকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধি-জীবিরা ছিল উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর সমতুল্য হইলেও তাহারা ছিল সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। শিল্পী, কারিগর এবং শ্রমিক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে ধনিক শ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত এবং নিপীড়িত ছিল দেশের অগণিত চাষী সম্প্রদায়। ইহাদের আর্থিক অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, কিন্তু ইহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক করভারে নিপীড়িত হইত। ইহারা যে প্রচলিত সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

তৃতীয় শ্রেণী

(৩) ফ্রান্সে কর ধার্য করিবার নীতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অভিজাত এবং সামন্ত শ্রেণীকে প্রায় কোন প্রকার কর প্রদান করিতে হইত না—সাধারণ মানুষকে করভার বহন করিতে হইত। সুতরাং যাহারা অধিক পরিমাণে কর প্রদান করিতে সক্ষম ছিল তাহাদের কর প্রদান করিতে হইত না। যাহারা ছিল দরিদ্র, দু'মুঠা অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিত তাহারই করভারে জর্জরিত হইত। এই বৈষম্যমূলক কর নির্দ্ধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

দরিদ্রের উপর করভার

(৪) **বিপ্লবের দর্শন : ফরাসী দার্শনিকবৃন্দ :** ফ্রান্সের এই শোচনীয় অবস্থায় দেশের চিন্তাশীল মনীষীগণ বিচলিত হইয়াছিলেন। শুধুমাত্র ফ্রান্সের নয় সমগ্র ইউরোপের অবস্থা ছিল এইরূপ। তথাপি ফ্রান্সের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। দেশের জনসাধারণের মনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের রচনায় তাহা প্রকাশ পাইল। ফলে ফ্রান্স তথা ইউরোপের মনোজগতে বিপ্লব সাধিত হইল। মানুষের মনে এক নূতন চেতনার উদ্ভব হইল এই সকল সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের রচনার মাধ্যমে। এইজন্য এই যুগকে নব চেতনার যুগ বা মানসিক উৎকর্ষের যুগ বলা হয়। এই চিন্তাশীল মনীষী বৃন্দের মধ্যে সর্বপ্রথম **মন্তেস্কর** নাম স্মরণীয়। **মন্তেস্ক'র** রচনার মধ্যে ছিল বিপ্লবের সুর। তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী—তিনি ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বৈরশাসনের তীব্র সমালোচনা করেন—সম্রাট ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করেন। মন্তেস্ক'র পরেই **ভল্টেয়ারের** নাম উল্লেখযোগ্য। তীব্র শ্লেষাত্মক রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ভল্টেয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী। রাষ্ট্রের দুর্নীতি এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। ফলে ধর্ম ও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পরই **রুশোর** নাম স্মরণীয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'সোস্যাল কনট্রাক্ট' (Social Contract) মতবাদের স্রষ্টা। তিনি ঘোষণা করিলেন মানুষ জন্মায় স্বাধীন কিন্তু সর্বত্র সে শৃংখলিত। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে বাস করিত তখন আত্মরক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে এক চুক্তি (Social Contract) দ্বারা তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে শাসনকার্যের জন্য কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। সুতরাং যদি কোন শাসক প্রজার কল্যাণ সাধন করিতে ব্যর্থ হন এবং প্রজার উপর উৎপীড়ন করেন তাহা হইলে ঐ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে এবং সেই শাসক বা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার

নৈতিক এবং আইনগত অধিকার জনসাধারণের থাকিবে। ইহাই হইল রুশোর মতবাদ। প্রজার সম্মতি ব্যতীত রাজা রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। জনসাধারণই হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রুশো মানুষের মধ্যে সাম্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার এই বিপ্লবী রচনা ফ্রান্স ও ইউরোপের জনসাধারণকে সর্বাত্মক বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। ফ্রান্সের এই সকল বিপ্লবী মনীষীবৃন্দের রচনার ফলে দেশের বহুবিধ দুর্নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হইয়াছিল এবং জনসাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছিল। মনস্তাত্বিক দিক হইতে জনসাধারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

(৫) ফ্রান্সের আর্থিক সংকট বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সুবিধাবাদী ধণিকশ্রেণী কর প্রদান করিত না এবং সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত কর প্রদানের ক্ষমতা ছিল না। চতুর্দ্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অমিতব্যয়িতার ফলে দেশে আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল। দুর্ভাগা সম্রাট ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তুর্গোট ও নেকারের ন্যায় অর্থনীতিবিদদের সাহায্যে অর্থ নৈতিক সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সামন্ত শ্রেণীর বিরোধিতায় তাহার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করিবার ফলে ফ্রান্সের আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। উপায়হীন সম্রাট ষ্টেটস্ জেনারেল (সামন্ত প্রভাবিত পার্লামেণ্ট) আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফলে জনসাধারণের ধারণা হইল স্বৈর শাসন ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং তাহারা বিপ্লবের জন্য উদ্গ্রীব হইল।

ফ্রান্সের আর্থিক সংকট

ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনে আরোহণ (১৭৭৪-৯৩): ১৭৭৪ খৃঃ ষোড়শ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহারই রাজত্বকালে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জনসাধারণের ক্ষোভ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছিল। তিনি সদিচ্ছাপরায়ণ এবং জনসাধারণের কল্যাণকামী ছিলেন। কিন্তু তিনি

ছিলেন দুর্বল—দুর্নীতিপরায়ণ সভাসদবর্গের বিরোধিতার ফলে তিনি অর্থ-নৈতিক সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন স্ত্রী মেরী আঁতোয়াণেৎ-এর প্রভাবাধীন। মেরী আঁতোয়াণেৎ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার কন্যা। তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী, দৃঢ়চেতা এবং বুদ্ধিমতী, কিন্তু অনভিজ্ঞা, ও অল্পবয়স্কা। তাহার মধ্যে দূর-দৃষ্টি এবং বিচার-বুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল। সুতরাং রাজার উপর তাহার প্রভাব দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়াছিল।

ষোড়শ লুই

অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা

ষোড়শ লুই নিদারুণ আর্থিক সংকটের সময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ লুইয়ের যুদ্ধ এবং অমিতব্যয়িতার ফলে আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ লুই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ তুর্গোটকে অর্থনৈতিক সংস্কারসাধনের জন্য ভার অর্পণ করিলেন। তুর্গোট ব্যয় সংকোচ এবং আয় বৃদ্ধির জন্য একাধিক সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অনেক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিলেন। ফলে সামন্তগণ এবং সভাসদবর্গ তুর্গোটের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের চাপে পড়িয়া এবং রাণীর পরামর্শে লুই তুর্গোটকে বরখাস্ত করিলেন। তুর্গোটের ন্যায় কৃতী অর্থ-নীতিবিদকে বরখাস্ত করিয়া লুই মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। তুর্গোটের স্থলাভিষিক্ত হইলেন আর একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নেকার। নেকার তুর্গোটের ন্যায় আয় ব্যয়ের ক্ষমতা বিধানের চেষ্টা করিলেন। তিনি আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত শ্রেণীর অনেক অন্যায় কার্যকলাপ এবং মাথা-ভারী শাসন ব্যবস্থার গলদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহাতে

সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ

সুবিধাভোগী সভাসদবর্গ নেকারের উপর ক্রুদ্ধ হইল এবং সম্রাটকে তাহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য করিল।

নেকারের পতনের পর সম্রাট কয়েকজন অপদার্থ মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের অযোগ্যতার ফলে সম্রাটের পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে বাঁচাইতে হইলে নূতন কর ধার্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নূতন কর ধার্য করা সম্রাটের পক্ষে সম্ভব ছিল না। চাপে পড়িয়া তিনি 'ষ্টেটস্ জেনারেল' আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৯) এবং মন্ত্রী সভার নেতৃত্ব করিবার জন্য নেকারকে আহ্বান করিলেন।

ষ্টেটস্ জেনারেল আহ্বান

বিগত ১৭৬ বৎসরের মধ্যে ষ্টেটস্ জেনারেলের কোন সভা আহ্বান করা হয় নাই। সুতরাং প্রায় দুই শতাব্দী পরে ইহাকে আহ্বান বিপ্লবের সুরু বলা যাইতে পারে। ষ্টেটস্ জেনারেলের প্রতি সভ্য এক একটি অভিযোগ তালিকা (Cashiers) উপস্থাপিত করিলেন। সামন্ত, যাজক এবং সাধারণ শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ সংবিধান সংশোধন এবং বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিতে একমত হইলেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার বিলোপের দাবী জানাইলেন। কিন্তু কেহই রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই।

ষ্টেটস্ জেনারেল ছিল সামন্ত পার্লামেণ্ট। কারণ তিন কক্ষবিশিষ্ট এই পার্লামেণ্টের দুই কক্ষ ছিল যাজক এবং সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ও আর একটি কক্ষ ছিল তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সুতরাং এই পার্লামেণ্টে যাজক ও সামন্তদের একাধিপত্য ছিল। তাহাদের সমবেত ভোটে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ পরাজিত হইত। ১৭৬ বৎসর পরে যখন এই মৃত পার্লামেণ্টকে আহ্বান করা হইল তখন তৃতীয় শ্রেণীর দাবী অনুযায়ী নেকার তৃতীয় শ্রেণীকে যাজক ও সামন্তশ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিনিধি সংখ্যার সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব দান করিলেন। কিন্তু শ্রেণী অনুযায়ী ভোটাধিকার থাকিবার ফলে এই প্রতিনিধিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়িল। ফলে বিরোধ দেখা দিল।

ষ্টেটস্ জেনারেল

১৭৮৯ খৃঃ ৫ই মে ষ্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন আরম্ভ হইলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ দাবী করিল যে ইহা আর সামন্ত পার্লামেণ্ট নয়, ইহা সমস্ত জাতির প্রতিনিধি সভা। তাহারা আরও দাবী করিল যে তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত ভাবে একটি সভায় মিলিত হইবে এবং প্রত্যেক প্রতিনিধির ভোটদানের অধিকার থাকিবে। কিন্তু যাজক ও সামন্ত শ্রেণী এই প্রস্তাবে বাধা প্রদান করিলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ইহা জাতীয় সভা (National Assembly) বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সমস্ত জাতির প্রতিনিধিরূপে কার্য করিবার সিদ্ধান্ত করিল। সম্রাট যাজক এবং সামন্তদের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় সভার অধিবেশন ব্যর্থ করিবার জন্য হলঘর বন্ধ করিয়া দিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুদ্ধ-সদস্যগণ নিকটবর্তী টেনিস কোর্টে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে দেশের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সভাভঙ্গ করা হইবে না। সম্রাট তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ অবৈধ ঘোষণা করিলেন। অভিজাত শ্রেণীর নেতা মিরাবো জনসাধারণের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তীব্র আন্দোলনে ভীত সম্রাট লুই জাতীয় সভাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

জাতীয় সভা

ব্যাষ্টিলের পতন : সম্রাটের দুর্বুদ্ধি তখনও শেষ হয় নাই। জাতীয় সভা দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্যারিসের নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং জনপ্রিয় মন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করিলেন। জনসাধারণ সম্রাটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইল। প্যারিসের উন্মত্ত জনসাধারণ প্রতিক্রিয়ার প্রতীক ব্যাষ্টিল কারাগার আক্রমণ করিল। রক্ষীদলের সহিত রক্তাক্ত সংগ্রামের পর জনসাধারণ ব্যাষ্টিল কারাগারে আটক বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিল এবং কারাগার ধ্বংস করিয়া দিল (১৪ই জুলাই ১৭৮৯)। ১৪ই জুলাইকে মুক্তি দিবস বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ব্যাষ্টিলের পতনে জনসাধারণের মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। জনসাধারণ প্যারিসের শাসনভার হস্তগত করিল এবং নূতন পৌর সরকার গঠন করিল। প্যারিস রক্ষার জন্য জাতীয় রক্ষী দল (National Guard) গঠন করা হইল। লাফায়েত ইহার সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন।

ব্যাষ্টিলের পতনের ফলাফল : এইরূপ সংটকজনক অবস্থা দেখিয়া সম্রাট লুই মাথা নত করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠ হইতে সৈন্য বাহিনী সরাইয়া দিলেন। নেকারকে পুনরায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন এবং জাতীয় রক্ষীদল স্বীকার করিয়া লইলেন। প্যারিসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ব্যাষ্টিলের পতনের সংবাদে সহরে সহরে বিদ্রোহ দেখা দিল,

ব্যাষ্টিলের পতন

বিভিন্ন সহরে পৌর সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জাতীয় রক্ষীদল গঠিত হইল। সামন্ত ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিপ্লব সুরু হইল।

ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহে ভীত সামন্তগণ জাতীয় সভার অধিবেশনে (৪ঠা আগষ্ট ১৭৮৯) স্বেচ্ছায় সকল প্রকার সুযোগ, সুবিধা এবং অধিকার ত্যাগ করিল। ফলে ফ্রান্সে শ্রেণী বৈষম্য আর রহিল না। সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত হইল।

কিন্তু জনসাধারণ রাজসভায় নূতন চক্রান্তের সন্ধান পাইল। প্যারিসে রুটির অভাবে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দিলে জনসাধারণের সন্দেহ দৃঢ় হইল। বহুসংখ্যক ক্ষুধার্ত এবং ক্রুদ্ধ নারী এক কামান লইয়া ভার্সাইএর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিল। এই বিক্ষোভে ভীত হইয়া সম্রাট ক্রুদ্ধ নারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। বস্তুতঃ পক্ষে সম্রাট জনসাধারণের হস্তে বন্দী হইয়া রহিলেন। রচিত হইল রাজতন্ত্রের সমাধি ক্ষেত্র।

জাতীয় সভার কার্যকলাপ ঃ পুরানো সংবিধান এবং সামন্ত শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ সুবিধা বাতিল করিবার পর জাতীয় সভা দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিল। এখন হইতে জাতীয়সভা 'কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী' (Constituent Assembly) নামে পরিচিত হইল। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্বেই 'অধিকারের ঘোষণা' (Declaration of Rights) দ্বারা প্রচার করা হইল—প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন এবং সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং জনসাধারণই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ইহার মধ্যে সাম্য, মৈত্রী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইল। ফ্রান্সের পুরানো শাসনব্যবস্থার পতন হইল এবং নূতন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হইল।

নূতন শাসনতন্ত্র ১৭৯১ খৃঃ গৃহীত হইল। দেশের শাসনভার সম্রাট এবং 'আইনসভা' নামে অভিহিত পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। শাসন-ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চে রহিলেন রাজা এবং তিনিই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন কিন্তু মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য হইবেন না। সম্রাটের হস্তে বস্তুতঃ কোন ক্ষমতা রহিল না। আইনসভার হস্তেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করা হইল। ৭৪৫ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া আইনসভা গঠিত হইল কিন্তু প্রত্যেক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হইল না। নূতন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হইল এবং জুরী দ্বারা বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। কিন্তু বিচারকদের পার্লামেণ্টের সদস্যদের ন্যায় নির্বাচিত করিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ফল শুভ হয় নাই। পুরাতন প্রদেশগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া ফ্রান্সকে ৮৩টি নূতন প্রদেশ বা ডিপার্টমেণ্টে

নূতন শাসনতন্ত্র

বিভক্ত করা হইল। নবগঠিত প্রদেশগুলি জেলা, ক্যাণ্টন এবং কমিউন-এ বিভক্ত করা হইল। প্রতিটি ডিপার্টমেণ্ট বা প্রদেশের জন্য একটি করিয়া কাউন্সিল বা প্রতিনিধিসভা এবং জেলা ক্যাণ্টন ও কমিউনে অনুরূপ প্রতিনিধি সভাদ্বারা শাসনের ব্যবস্থা করা হইল। সুতরাং শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হইল। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি বা গীর্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং কাগজের নোট প্রবর্তন করা হইল।

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা

যাজক শ্রেণীর ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। যাজকদের জনসাধারণের ভোটে নির্বাচন করিবার এবং রাজকোষ হইতে তাহাদের বেতন দানের ব্যবস্থা করা হইল। Civil constitution of the Clergy নামক আইনের দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইল।

চার্চের পুনর্গঠন

কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিতে যাইয়া আইনসভার সদস্যগণ দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। সম্রাটের হস্তে প্রায় কোন ক্ষমতাই ছিল না এবং মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য না থাকিবার ফলে সম্রাট এবং তাহার মন্ত্রী ও আইনসভার মধ্যে যোগাযোগের অভাব ছিল। শাসন বিভাগ দুর্বল হইবার ফলে শাসনব্যবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। শাসন বিভাগ এবং আইনসভার মধ্যে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হইবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সম্পত্তির মালিকানা অনুযায়ী ভোটাধিকার দান করার ফলে বহু নাগরিক ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। সুতরাং Declaration of Rights বা 'অধিকারের ঘোষণা' উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা হইলেও সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দ্বারা এই ঘোষণার মূল আদর্শকে লংঘন করা হইয়াছিল। ধর্মসংক্রান্ত আইন (Civil constitution of the clergy) প্রণয়ন উচিত হয় নাই, কারণ ইহার ফলে বহু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর যাজক যাহারা বিপ্লবকে স্বাগত জানাইয়াছিল তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল এবং ফরাসীগণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিচারকদের জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও

সমালোচনা

আইনসভার কতকগুলি কার্য দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। প্রথমতঃ আইনসভা কর্তৃক প্রাচীন শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন এবং প্রত্যেকের সমানাধিকার স্বীকার। দ্বিতীয়তঃ প্রদেশগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া নূতন 'ডিপার্টমেণ্ট' বা প্রদেশ গঠন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। প্রাদেশিক সুযোগ সুবিধা এবং পৃথক পৃথক ব্যবস্থাগুলি বিনষ্ট করিবার ফলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল।

মিরাবো ঃ মিরাবো ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। কিন্তু তিনি নিজশ্রেণী হইতে ষ্টেটস্ জেনারেলের সদস্য মনোনীত হইতে না পারিয়া তৃতীয়-শ্রেণীকর্তৃক ষ্টেট্‌স্ জেনারেলের সদস্য মনোনীত হন। তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা এবং অসাধারণ বাগ্মীতার গুণে তিনি শীঘ্রই নেতারূপে পরিগণিত হন। মিরাবো স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী হইলেও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় সভায় তিনিই একমাত্র বিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি সম্রাটকে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আপোষমূলক নীতি কার্যকরী হয় নাই। তিনি একাধিকবার সম্রাটকে প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃংখল জনতার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইবার, এবং প্যারিসের জনতার উচ্ছৃংখল এবং বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমগ্র ফরাসী জাতিকে তাহার (সম্রাটের) নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট অত্যন্ত বিলম্বে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ফলে তাহার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসীজাতি মিরাবোর প্রতিভাকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। রাজতন্ত্রের ভক্তগণ তাহাকে জনতার নেতা বলিয়া অবিশ্বাস করিত, এবং বিপ্লবী জনসাধারণ তাহাকে রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিত। প্রথমজীবনের (সামন্তজীবনের) অন্যায় কার্যাবলী তাহার সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছিল। ভগ্নহৃদয়ে মিরাবো ১৭৯১ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সম্রাটের পলায়নের চেষ্টা : হাঙ্গামাকারী বুভুক্ষু নারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট যখন ভার্সাই হইতে প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তখন হইতেই তিনি কার্যতঃ প্যারিসের জনতার হস্তে বন্দী জীবন যাপন করিতেছিলেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি প্রায় ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিরাবোর মৃত্যুর ফলে তিনি রাজতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থককে হারাইয়াছিলেন। এই অবস্থায় সম্রাট দেশত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু পলায়নের পথে ফ্রান্সের সীমান্তে ভোরেনিজ'এ সপরিবারে বিপ্লবীদের হস্তে বন্দী হইলেন। চূড়ান্ত অপমান করিতে করিতে বন্দী অবস্থায় তাহাকে প্যারিসে আনয়ন করা হইল এবং সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইল (২১শে জুন ১৭৯১)।

সম্রাটের পলায়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। জনসাধারণ মনে করিল যে ফ্রান্সে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তিনি তাহার বিরোধী এবং মনে প্রাণে তিনি 'এমিগার'দের (দেশত্যাগী ফরাসী সামন্তগণ) পক্ষভুক্ত। সম্রাটের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল এবং তাহার আন্তরিকতায় তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল। ইহার ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী দলের উদ্ভব হইল। রোবস্পীয়র, দাঁতঁন প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রী নেতৃবর্গ সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইলেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ তখনও শক্তিশালী ছিল। প্রজাতন্ত্রীদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা সম্রাটকে পুনরায় রাজকীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিল। সম্রাট শাসনতন্ত্র মানিয়া লইলেন এবং ইহা সমর্থন করিবার শপথ গ্রহণ করিলেন। শাসনতন্ত্র রচনা সমাপ্ত ; সুতরাং জাতীয়সভা বা কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর সদস্যগণ জাতীয় সভা ভাঙ্গিয়া দিল।

বিপ্লবের প্রতি ইউরোপের মনোভাব : ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব গভীর ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছিল। উদারনৈতিক মনীষীগণ ইহাকে নবযুগের সূচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফক্সের ন্যায় বাগ্মী এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের ন্যায় সাহিত্যিকগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বার্ক ফরাসী বিপ্লবের

প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পক্ষে ইউরোপের শক্তিবর্গ বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল যে বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে—সুতরাং তাহাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ফ্রান্সকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিতে পারিবে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ যখন ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তখন শক্তিবর্গ আতংকিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিণ এই সুযোগে পোল্যাণ্ড গ্রাস করিবার মতলব করিলেন।

একাধিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভবঃ নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৭৯১ খৃঃ ১লা অক্টোবর আইনসভার প্রথম অধিবেশন হয়। ৭৪৫ জন সদস্য সমন্বিত এই আইনসভা অনভিজ্ঞ নূতন সদস্যদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই নূতন সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী। রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমগ্র ফ্রান্সে ইহারা প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিরামহীন প্রচার চালাইতেছিল। এই ক্লাবগুলির মধ্যে জেকোবিন এবং কর্ডেলিয়ার ক্লাব উল্লেখযোগ্য। জেকোবিন ক্লাব প্রথমে নরমপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকারীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু ক্রমে ইহারা চরমপন্থী হইয়া পড়ে। লাফায়েৎ ও মিরাবোকে সরাইয়া রোবস্পীয়রকে নেতৃপদ প্রদান করা হয়। দাঁতঁন কর্তৃক পরিচালিত কর্ডেলিয়ার ক্লাব ছিল প্রজাতন্ত্রীদের আর একটি শক্তিশালী সংগঠন।

আইনসভায় মোটামুটি ভাবে তিনটি দল ছিল। নিয়মতান্ত্রিক, জিরোণ্ডিষ্ট ও জেকোবিন। প্রথমতঃ নিয়মতান্ত্রিক দল ছিল নূতন শাসনতন্ত্রের সমর্থক। সুতরাং ইহা ছিল সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থনকারী। কারণ নূতন শাসনতন্ত্রে সম্রাটকে উচ্ছেদ করা হয় নাই। জিরোণ্ডিষ্ট এবং জেকোবিন উভয় দলই ছিল প্রজাতন্ত্রবাদী। জিরোণ্ডিষ্টরা ছিল নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী—ইহাদের নেতারা

অধিকাংশই ছিল জিরোণ্ড প্রদেশের অধিবাসী। এইজন্য ইহাদের নাম হইয়াছিল জিরোণ্ডিষ্ট। জেকোবিনরা (মাউণ্টেন নামেও অভিহিত) ছিল চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী। ইহারা ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল। আইনসভায় জিরোণ্ডিষ্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও দেশের অভ্যন্তরে জেকোবিনদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল।

আইনসভার কার্যাবলী ঃ আইনসভা এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল যে, সমস্ত ধর্মযাজকগণকে 'সিভিল কনষ্টিটিউসন অব দি ক্লার্জি'র (Civil Constitution of the Clergy) বিধান মানিয়া চলিতে হইবে। যাহারা ইহা অমান্য করিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। আইনসভা আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিল যে 'এমিগার'গণ (দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাতগণ—ইহারা পলাইয়া অন্যান্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিপ্লব দমন করিবার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে উস্কানি দিতেছিলেন) যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন না করে তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে এবং ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। কিন্তু সম্রাট দুইটি প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিলেন। অবশ্য নিজ ভ্রাতাকে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করিলেন। সম্রাটের এই কার্যের ফলে জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইল। তাহাদের ধারণা হইল যে সম্রাট শাসনতন্ত্র সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে শাসনতন্ত্রের বিরোধী। চরমপন্থীদের প্রচারের ফলে উত্তেজিত জনতা সম্রাটের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে তুলারীজ প্রাসাদ আক্রমণ করিল (২০শে জুন ১৭৯২)।

ইউরোপের সহিত সংগ্রাম ঃ প্রথমতঃ সম্রাট ষোড়শ লুইকে ক্রমাগত যে ভাবে অপমান করা হইতেছিল তাহাতে ইউরোপের রাজন্যবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতাদের অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে বিপ্লবের আদর্শ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইলেন।

কারণসমূহ

দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সে সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সামন্তগণ তাহাদের প্রাপ্য কর হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের অন্তর্গত আলসাস প্রদেশে জার্মান সামন্তদের অনেক জমিদারী ছিল। সামন্ত কর বিলুপ্ত হইবার ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ ফরাসীগণ ফ্রান্সের ভৌগলিক সীমানার অন্তর্গত এভিগনন্ অধিকার করিয়াছিল। এভিগনন্ চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই পোপের শাসনাধীন ছিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি বিরোধী এই কার্য ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করিয়াছিল। এই সকল কারণ সত্বেও হয়ত ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ফ্রান্সের সংঘর্ষ হইত না। কিন্তু ক্রমাগত সাফল্যে উৎসাহিত ফরাসীগণ বিপ্লবের বাণী সমগ্র ইউরোপে প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কারণ বিপ্লব দীর্ঘজীবী করিতে হইলে ইউরোপের প্রাচীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া সম্রাজ্ঞী এবং রাজভক্ত এমিগারগণ যখন বৈদেশিক সাহায্যের আবেদন জানাইলেন তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল।

ফ্রান্সের জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এমিগারদের কার্যকলাপে ইন্ধন যোগাইতেছে। এমিগারগণ জার্মান সীমান্তে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল। বিপ্লবী নেতৃবর্গের ধারণা হইয়াছিল যে সম্রাট যখন আইনসভা কর্তৃক এমিগারদের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন তখন সম্রাটও নিশ্চয়ই এমিগারদের কার্যকলাপ সমর্থন করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ছিলেন ফরাসী সম্রাজ্ঞী মেরী আঁতোয়ানেৎএর ভ্রাতা। প্রাশিয়ার সম্রাটের সহিত একত্রিত হইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে ফরাসী সম্রাটকে সাহায্য করা ইউরোপের প্রত্যেক নৃপতির কর্তব্য। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যোগদান করিলে তাহারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিবেন (প্লিলনিজের ঘোষণা ২৭শে আগস্ট ১৭৯১)। ফ্রান্সের উত্তেজিত বিপ্লবী নেতৃবর্গ এমিগারদের সহিত সম্পর্কের কৈফিয়ৎ দাবী করিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ইহা অগ্রাহ্য করায় আইনসভার জিরোণ্ডিষ্টগণ সম্রাটকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে

প্লিলনিজের ঘোষণা

যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল। এপ্রিল ১৭৯২)। প্রাশিয়া ছিল অষ্ট্রিয়ার মিত্র, সুতরাং প্রাশিয়াও যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল।

ঘটনাবলী ঃ সন্ত্রাসের রাজত্ব ঃ ফরাসী সৈন্যবাহিনী অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত বেলজিয়াম আক্রমণ করিতে যাইয়া অষ্ট্রিয়ার ও প্রাশিয়ার মিলিত সৈন্যবাহিনীর হস্তে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু জনসাধারণের ক্রোধ হতভাগ্য সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের উপর পড়িল। তাহারা সম্রাটকে দেশদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল। প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ডিউক অব বার্ণসউইক সম্রাটের বিপদ উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করিলেন যে রাজপরিবারের উপর বলপ্রয়োগ করা হইলে তিনি প্যারিসের জনসাধারণের উপর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন এবং প্যারিস ধূলিসাৎ করিবেন। কিন্তু ইহাতে সম্রাটের বিপদ বাড়িল। প্যারিসের জনতার ধারণা হইল প্রাশিয়া-অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর সহিত সম্রাটের যোগাযোগ আছে। ক্রুদ্ধ জনতা ১০ই আগাষ্ট তুলারিজ প্রাসাদ আক্রমণ করে। সম্রাট আত্মরক্ষার্থেও রক্ষীদলকে গুলি বর্ষণের নির্দেশ প্রদান করেন নাই। প্রাণভয়ে ভীত সম্রাট প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া আইন সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তুলারিজ প্রাসাদ ধ্বংস করা হইল। সম্রাটের দেহরক্ষী সৈন্যদলকে নির্মমভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যা করা হইল।

জনতার প্রাসাদ আক্রমণ

অতঃপর আইনসভা সম্রাটকে পদচ্যুত করিল এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এক জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিল। প্যারিসের উন্মত্ত জনতার নির্দেশে আইনসভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। জেকোবিনদের নেতৃত্বে জনতা প্যারিসের পৌরশাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া প্যারিসের শাসনভার 'কমিউন' বা নাগরিক কমিটির উপর ন্যস্ত করিল। উত্তেজিত জনতার নেতা হইলেন দাঁতঁন, ম্যারাট এবং রোবস্‌পীয়র। জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের পূর্ব পর্যন্ত তাহারা ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা হইলেন।

প্যারিসের কমিউন

ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দ্রুত প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত জেকোবিন নেতৃবৃন্দ

রাজতন্ত্রে সমর্থকদের পাইকারী হারে হত্যার নির্দেশ দিলেন। একদল ভাড়াটে জল্লাদ নিযুক্ত করা হইল—যাহারা কারাগার আক্রমণ করিয়া রাজতন্ত্রের সমর্থক সন্দেহ করিয়া সহস্রাধিক বন্দীকে টুকরা টুকরা করিয়া হত্যা করিল। এই নারকীয় হত্যালীলার নায়ক ছিলেন ম্যারাট। ইতিহাসে এই রক্তাক্ত অধ্যায় সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত—বিপ্লবের ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায়।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড

সৌভাগ্যক্রমে ভ্লামির যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল এবং লিলি হইতে অষ্ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনী বিতাড়িত হইল। জেমাপ্পির যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। বিজয়ী ফরাসী সৈন্যদল বেলজিয়াম, নাইস এবং স্যাভয় অধিকার করিল। আনন্দমুখর ফরাসী জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক"। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত এমিগারদের চক্রান্ত, ইউরোপের শক্তিবর্গের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ এবং সম্রাটের চরম দুর্বলতা ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করিল।

জাতীয় সম্মেলনের কার্যকলাপ ঃ আইন সভার অবলুপ্তির পর জাতীয় সম্মেলনের (National Convention) অধিবেশন আরম্ভ হইল (২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২)। জাতীয় সম্মেলন প্রথমেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। এমিগারদের চিরতরে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন হইতে নূতন ক্যালেণ্ডার বা বর্ষগণনার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইল।

যখন সর্বসম্মতিক্রমে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইল তখন সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের প্রশ্ন উঠিল। রোবস্-পীয়রের নেতৃত্বে জেকোবিন দল বিনা বিচারে সম্রাটকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু জিরোণ্ডিষ্ট দল জনসাধারনের মতামত গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু জেকোবিনরা জাতীয় সম্মেলনে সংখ্যাগরিষ্ঠাতা অর্জন করিল। সম্রাটের বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হইল। রাষ্ট্রদ্রোহ এবং জাতির

সম্রাটের মৃত্যুদণ্ড

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সম্রাটকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। হতভাগ্য সম্রাটকে গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করা হইল (২১শে জানুয়ারী ১৭৯৩)।

সম্রাটকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সমালোচনা

বলা হইয়াছে সম্রাটকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা অন্যায় ও ভুল হইয়াছিল (both a crime and blunder)। প্রজাবৎসল এবং নিরীহ সম্রাটকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত হয় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে চরম নিষ্ঠুরতা এবং অন্যায়ের পরিচয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রজাতন্ত্রের কোন লাভ হয় নাই বা বিপ্লবের আদর্শের মর্যাদা বৃদ্ধি করে নাই। বরং সম্রাটের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ফ্রান্সকে একাধিক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহারই ফল স্বরূপ ফ্রান্সে সুরু হইয়াছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব যাহা প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী না করিয়া দুর্বল করিয়াছিল এবং নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের পথ সুগম করিয়াছিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিজোট : সাময়িক সাফল্যে উৎসাহিত প্রজাতন্ত্রীদের আক্রমনাত্মক কার্যকলাপে ফ্রান্স শীঘ্রই ইউরোপের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। তাহারা এক প্রচারপত্রের দ্বারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে সম্রাট বা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আহ্বান জানাইল এবং সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। এই ধরণের প্রচার অন্যান্য দেশের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। কিন্তু

যুদ্ধের কারণ

ইউরোপের সহিত ফ্রান্সের সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের সংগ্রাম ছিল না। ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। বিপ্লবের ফলে দেশে শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছিল। বহুসংখ্যক লোক প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। ইহাদের কোন প্রকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করিয়া সৈন্য-বাহিনী হইতে ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং ফ্রান্সের আভ্যন্তরীন শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল।

সুতরাং ফ্রান্সের জঙ্গীবাদী মনোভাব এবং সম্রাট ষোড়শ লুইকে কাণ্ডজ্ঞান-হীন ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ফলে সমগ্র ইউরোপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইল। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। ফ্রান্স কর্তৃক বেলজিয়াম অধিকৃত হইবার ফলে ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ডের স্বার্থ বিপদাপন্ন হইয়াছিল। সম্রাট লুইয়ের মৃত্যুদণ্ডে ইংলণ্ড ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। বেসরকারী ফরাসী রাষ্ট্রদূত চৌভেলিনকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার নির্দেশ প্রদান করা হইল। ইংলণ্ডের এই মনোভাবে ক্রুদ্ধ ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক শক্তিজোট গড়িয়া উঠিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই প্রথম শক্তিজোটে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া এবং স্পেন যোগদান করিল। ফ্রান্সের সহিত শক্তি-জোটের রাষ্ট্রগুলির শুধুমাত্র আদর্শগত বিরোধ ছিল না। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিজোট

যুদ্ধের প্রথমেই ফরাসীগণ অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর নিকট নের-উনডেনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বেলজিয়াম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী রাইন অঞ্চল হইতে ফরাসী বাহিনী বিতাড়িত করিল; ইংরেজবাহিনী ডানকার্ক অবরোধ করিল এবং স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া রুসিলন অধিকার করিল। এদিকে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল।

ফ্রান্সের বিপর্যয়

কিন্তু এই বিপদে ভীত না হইয়া ফ্রান্সের নায়কগণ স্বদেশে এবং বিদেশে প্রজাতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করিবার জন্য নয়জন সদস্য বিশিষ্ট একটি 'জন নিরাপত্তা কমিটি' গঠন করিল (Commitee of public safety)। এই সময় জিরোণ্ডিষ্ট এবং জেকোবিন দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিল। জিরোণ্ডিষ্টরা সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদানের পক্ষপাতী ছিল এবং প্যারিসের কমিউনের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিল। চরমপন্থী জেকোবিন দল জিরোণ্ডিষ্ট দলকে ধ্বংস করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিসে জিরোণ্ডিষ্টদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। ক্রুদ্ধ

জনতা জাতীয় সম্মেলন বা কনেভেনসন ভবন আক্রমণ করিয়া একত্রিশ জন জিরোণ্ডিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য করিল। ইহার ফলে জিরোণ্ডিষ্টদের পতন হইল। তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। জেকোবিন দল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তগত করিল। রক্তপিপাসু ম্যারাট, দাঁতঁন এবং রোবস্পীয়য়ের নেতৃত্বে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

জিরোণ্ডিষ্ট দলের পতন

সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror)ঃ ১৭৯৩ খৃঃ ২রা জুন হইতে ১৭৯৪ খৃঃ জুলাই পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' নামে পরিচিত। কনভেনসন হইতে জিরোণ্ডিষ্টদের বহিস্কৃত করিবার ফলে ফ্রান্সে নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের বিলুপ্তি হইল এবং জেকোবিন নেতৃত্বে স্থরু হইল ভীতির রাজত্ব, ফ্রান্সের ইতিহাসের কলংকজনক অধ্যায়। প্যারিসের কমিউনই বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু ইহার ফলে অন্যান্য সহরগুলিতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। লা—ভেণ্ডী নামক স্থানে ক্যাথলিক এবং রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সহযোগিতায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। স্থতরাং জেকোবিনদের আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণ এই দুইটি গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জেকোবিন দল লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের পথে অগ্রসর হইল।

জন নিরাপত্তা কমিটির উপর ফ্রান্সের শত্রুদের নিধন করিবার ভার অর্পন করা হইয়াছিল। বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের শত্রুদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কমিটি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রথমতঃ 'দি ল অব সাসপেক্টস্' (The Law of Suspects) নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হইল। রাজতন্ত্রী এবং বিপ্লব বিরোধীদের প্রত্যেককে কারাগারে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হইল। দ্বিতীয়তঃ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বা অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্যে একটি বিপ্লবী ট্রাইবুনাল গঠন করা হইল (Revolutionary Tribunal)। এই ট্রাইবুনালের বিচার প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। কারণ জেকোবিন বিরোধীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই ছিল ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ বিপ্লবী ট্রাইবুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের শিরচ্ছেদ করিবার জন্য গিলোটিন নামক এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করা হইল। বিপ্লবী ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক সহস্র ব্যক্তিকে গিলোটিনে হত্যা করা হইল। জেকোবিন নেতৃবৃন্দের এই নির্মম নিষ্ঠুরতায় সমগ্র ইউরোপ স্তম্ভিত হইল। সম্রাজ্ঞী আঁতোয়ানেৎকে চূড়ান্ত অবমাননা করিবার পর গিলোটিনে হত্যা করা হইল। জিরোণ্ডিষ্ট দলের বিখ্যাত নেত্রী মাদাম রোলাণ্ড, ডিউক অব অরলিয়েন্স এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় জিরোণ্ডিষ্ট নেতাদের গিলোটিনে প্রাণ হারাইতে হইল। জেকোবিন নেতাদের নির্দেশে সমগ্র ফ্রান্সে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। সমগ্র দেশে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইল। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন ম্যারাট। শত সহস্র দেশপ্রেমিক ফরাসী সন্তানের অভিশাপে তাহার শোচনীয় পরিণতি ঘনাইয়া আসিল। অষ্টাদশ বর্ষীয়া নর্মান তরুণী কার্লো কার্দের ছুরিকাঘাতে ম্যারাট প্রাণ হারাইলেন।

লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড

ইহার পরই 'জন নিরাপত্তা কমিটি' লায়নস্ এবং ভেণ্ডীর কৃষক বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করিল। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে কঠোরভাবে সকল বিরোধিতা দমন করা হইল। এইবার 'জন নিরাপত্তা কমিটি' বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

কৃষক বিদ্রোহ

যুদ্ধ দপ্তরের ভার ছিল কারনটের উপর। তাহার সংগঠনী প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি দ্রুত ফরাসীবাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া ডানকার্ক হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিলেন এবং ওয়াটিংনিজ নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ান সৈন্য-বাহিনী পরাজিত করিলেন। অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়া বাহিনী রাইন অঞ্চলে পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য হইল। ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ড অধিকার করিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেলজিয়াম এবং তুলোঁ ফরাসী বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। ফরাসী বাহিনীর এই বিস্ময়কর সাফল্যে ইউরোপ বিস্মিত হইল। ১৭৯৫ খৃঃ স্পেন এবং প্রাশিয়া, ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল (Treaty of Basle)।

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত

সুতরাং মাত্র ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত শক্তি জোট কার্যতঃ ভাঙ্গিয়া গেল।

জেকোবিন দলে ভাঙ্গন : বিপ্লবকে স্মরণীয় করিবার জন্য পুরাতন ক্যালেণ্ডার পরিবর্তন করিয়া নূতন ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। ২১শে সেপ্টেম্বর (১৭৯২) প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিন হইতে নূতন যুগ এবং বর্ষ গণনার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল।

ইহার পরই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হইল। বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবার জন্য দেশের অভ্যন্তরে সকল বিরোধিতা স্তব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রক্তাক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিপদ হইতে ফ্রান্স মুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং সন্ত্রাসের রাজত্বের আর প্রয়োজন ছিল কিনা ইহা লইয়া গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। প্যারিসের কমিউন কর্তৃক সমর্থিত নেতা হার্বার্ট এবং তাহার অনুগামীগণ ছিলেন সর্বাপেক্ষা চরমপন্থী। তাহারা সামাজিক বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার চালাইতে লাগিল এবং উপাসনার স্থানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য এক আইন প্রণয়ন করিল। কিন্তু এই অতি-বিপ্লবীদের কার্যে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইলেন।

হার্বার্টের পতন

অবশেষে রোপস্পীয়রের নির্দেশে হার্বার্ট এবং তাহার সকল অনুগামীকে গিলোটিনে হত্যা করা হইল। যাহারা এযাবৎকাল অগণিত নরনারীকে গিলোটিনে হত্যা করিয়াছেন এইবার তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। নিজেরাই একে অপরকে গিলোটিনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

হার্বার্টের পতনের পর দাঁতঁনের পালা আসিল। আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিপদের কারণ না থাকায় দাঁতঁন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই যুক্তি রোপস্পীয়র এবং তাহার অনুগামীদের নিকট অসহ্য হইল। দেশদ্রোহী এবং বিপ্লব বিরোধী আখ্যা দিয়া দাঁতঁন এবং তাহার সকল অনুগামীদের গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করা হইল। দাঁতঁন ছিলেন জেকোবিনদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাহারই উদ্যম এবং প্রচেষ্টার ফলে ১৭৯২ খৃঃ প্রাশিয়ার

দাঁতঁনের পতন

সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছিল এবং ফ্রান্সে শক্তিশালী সরকার গঠন সম্ভব হইয়াছিল। অহেতুক রক্তপাতের তিনি বিরোধী ছিলেন। জেকোবিন এবং জিরোণ্ডিষ্টদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাতন্ত্রীদের শক্তিশালী করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ম্যারাট এবং রোবস্পীয়র অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে তিনি অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

বাকী রহিলেন রোবস্পীয়র। কনভেনসন, প্যারিসের কমিউন এবং জন নিরাপত্তা কমিটির উপর তাহার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। হাজার হাজার নাগরিককে গিলোটিনে প্রেরণ করিয়াও রোবস্পীয়র তৃপ্ত হন নাই। তাহার নির্দেশে মাত্র ৪৫ দিনের বিপ্লবী ট্রাইবুনাল ১৩৭৬ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কোন প্রয়োজন ছিল না। দেশবাসীর নিকট ইহা অসহ্য হইল। রোবস্পীয়রের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দল গঠিত হইল। এই দলের নির্দেশে রোপস্পীয়রকে গ্রেপ্তার করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ম্যারাটের ন্যায় রোবস্পীয়রও বিপ্লবের ইতিহাসের কলংকজনক অধ্যায়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন। কিন্তু রোবস্পীয়রকে শুধুমাত্র রক্ত পিপাসু বলিয়া অভিহিত করা হইলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। বিপ্লবকে দীর্ঘজীবি করিবার জন্য এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার অক্লান্ত প্রচেষ্টা তাহার কর্মপ্রতিভার নিদর্শন। তিনি রুশোর আদর্শের অনুগামী ছিলেন।

রোবস্পীয়রের পতন

রোবস্পীয়র

রোবস্পীয়রের পতনের পর তাহার বিরোধী দল শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিল। রক্তপাতের যুগ শেষ হইল। প্যারিসের কমিউন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; বিপ্লবী ট্রাইবুনাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; জন নিরাপত্তা কমিটির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা হইল এবং জেকোবিন ক্লাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

নূতন সংবিধান; কনভেনসনের কৃতিত্ব ঃ কনভেনসন শেষ পর্যন্ত এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। এই শাসনতন্ত্রে দেশের শাসনভার পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট ডাইরেক্টরী বা পরিচালক মণ্ডলীর উপর অর্পণ করা হইল। দুইকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা থাকিবে। একটির নাম হইবে "Council of the Five Hundred" এবং অন্যটির নাম হইবে "Council of the Ancients"। যাহাতে আইন সভায় রাজতন্ত্রীরা প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য বলা হইল যে নূতন আইন সভার সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ কনভেনসনের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। কিন্তু এই নির্দেশ প্যারিসের জন সাধারণের পছন্দ হইল না। রাজতন্ত্রীদের চক্রান্তে প্যারিসে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রোহ দমন করিবার দায়িত্ব নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামক তরুণ সেনানায়কের উপর অর্পণ করা হইল। অতি সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করিয়া নেপোলিয়ন কনভেনসন এবং শাসনতন্ত্র রক্ষা করিলেন। আরম্ভ হইল নেপোলিয়নের যুগ। ২৬শে অক্টোবর কনভেনসনের সদস্যগণ কনভেনসন ভাঙ্গিয়া দিল।

নূতন সংবিধান

তিন বৎসর কার্যকালে কনভেনসন একাধিক কল্যাণকর কার্য করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিয়াছিল। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কনভেনসন ফ্রান্সে মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিল। বিভিন্ন সংস্কারের উদ্দেশ্যে সিভিল কোড প্রবর্তন করিয়াছিল—যাহা বাস্তবে রূপদান করিয়া নেপোলিয়ন পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। লুভারের মিউজিয়াম, ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং একাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষণ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

কৃতিত্ব

ডাইরেক্টরীর শাসন ১৭৯৫-৯৯ ঃ পূর্ব হইতেই ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া এবং সার্ডিনিয়ার সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। শক্তিশালী নৌ বাহিনী ব্যতীত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ডাইরেক্টরী অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দুইদিক হইতে

দুইটি অভিযান প্রেরণ করা হইল। একটি জার্মানীর মধ্য দিয়া, উহার সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন জোর্ডান এবং মোরো। দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করা হইল ইটালীর মধ্য দিয়া। এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ইটালী অভিযানই হইল নেপোলিয়নের সৌভাগ্যের সোপান।

নেপোলিয়নের প্রথম জীবন ঃ ১৭৬৯ খৃঃ কর্সিকা দ্বীপের অন্তর্গত আজাকিও নামক স্থানে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বে জেনোয়া এই দ্বীপটি ফ্রান্সের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং নেপোলিয়ন ফরাসী নাগরিক হন। তিনি ব্রিয়ণ ও প্যারিসে সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে তিনি গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন এবং তুলোঁ অবরোধের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ১৭৯৫ খৃঃ কনভেনসনের বিরুদ্ধে প্যারিসে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহা দমন করিয়া তিনি কনভেনসনের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। অতঃপর তাহার এই সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ইটালী অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। ইহার পর হইতে বিপ্লবের ইতিহাস নেপোলিয়নের জীবনীর সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেল।

নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান ঃ সামান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অল্প-সংখ্যক ফরাসী সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া নেপোলিয়ন ইটালী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী বাহিনীর দ্বিগুণ সংখ্যক অষ্ট্রিয়া এবং সার্ডি-নিয়ার সৈন্যদল সুসজ্জিত হইয়া নেপোলিয়নকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইল ; কিন্তু অতুলনীয় সামরিক প্রতিভার অধিকারী নেপোলিয়ন বিদ্যুৎগতিতে তুরিণ'এর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সার্ডিনিয়ার অধিপতি স্তাভয় এবং নীস প্রদান করিয়া নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর অষ্ট্রিয়ার শক্তি চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয় বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া আদ্দা নদীর উপর লোদী সেতু অতিক্রম করিয়া মিলানে উপনীত হইলেন। পরাজিত ও ভয়ার্ত অষ্ট্রিয়া সৈন্যগণ মান্তুয়া নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নেপোলিয়ন মান্তুয়া অবরোধ করিলেন।

ইহার পূর্বে তিনি লোম্বার্ডি অধিকার করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী শত চেষ্টা করিয়াও মানতুয়া অবরোধ মুক্ত করিতে পারিল না। নেপোলিয়ন মান্‌তুয়া অধিকার করিলেন। বাসানো, আরকোলা এবং রিভলোলির যুদ্ধে অষ্ট্রিয় বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার পর নেপোলিয়ন পোপের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং পোপকে টোলেন-টিনো'র সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। পোপ নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হইলেন, কয়েকটি অঞ্চল নেপোলিয়নকে অর্পণ করিলেন এবং ইটালীর নব গঠিত প্রজাতন্ত্রগুলি স্বীকার করিয়া লইলেন। বিজয় অভিযানে মত্ত নেপোলিয়ন সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া ভিয়েনার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ভীত হইয়া নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই ইতিহাসে ক্যাম্পো ফোর্মিও'র সন্ধি নামে খ্যাত (১৭৯৭)। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্সকে বেলজিয়াম অর্পণ করিল; আইওনিও দ্বীপগুলির উপর ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল এবং রাইন পর্যন্ত ফ্রান্সের সীমান্ত স্বীকার করিয়া লইল। নেপোলিয়ন লোম্বার্ডিতে 'সিসেল পাইন প্রজাতন্ত্র' এবং জেনোয়ার 'লিগুরিয়া প্রজাতন্ত্র' গঠন করিলেন। এই দুইটি প্রজাতন্ত্রে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট এই দুইটি পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ইহার পরিবর্তে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে ভেনিস এবং ডালমাটিয়ার ভিনিসীয় অঞ্চলগুলি পাইল। ক্যাম্পো ফোর্মিও'র সন্ধি ফ্রান্সের বিরাট সাফল্যের পরিচয়। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত প্রথম শক্তিজোটের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি বিধ্বস্ত হইল। অষ্ট্রিয়ার শক্তি ও মর্যাদা পদদলিত করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই চমকপ্রদ সাফল্যের ফলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনানায়কে পরিণত হইলেন। লক্ষ লক্ষ ফরাসী নেপোলিয়নকে অভ্যর্থনা জানাইল। বিজয়ী বীরের জয়গানে সমগ্র ফ্রান্স উদ্বেল হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়নে বিস্ময়কর সাফল্য

ক্যাম্পো ফোর্মি'ওর সন্ধি

অস্ট্রিয়ার বিপর্যয়

মিশর অভিযান ঃ অতঃপর একমাত্র শত্রু ইংলণ্ডকে পরাজিত করিবার জন্য নেপোলিয়নকে ইংলণ্ড অভিযানের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু শক্তিশালী নৌবাহিনী ব্যতীত ইংলণ্ড বিজয় অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীকে মিশর আক্রমণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। কারণ মিশর অধিকার করিতে পারিলে প্রাচ্যদেশে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য বিনষ্ট হইবে এবং ইংলণ্ড শোচনীয় অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইবে। ডাইরেক্টরীও অনুভব করিয়াছিল যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ব্যতীত ইংলণ্ড বিজয় সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া ডাইরেক্টরী নেপোলিয়নের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত ও ভীত হইয়াছিল। সুতরাং তাহাকে ফ্রান্স হইতে সাময়িকভাবে সরাইয়া দিবার জন্য ডাইরেক্টরী মিশর অভিযানে সম্মতি প্রদান করিল।

নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য

মিশর বিজয় ছিল নেপোলিয়নের প্রাচ্য পরিকল্পনার (লেভাণ্টাইন প্রজেক্ট, Levantine Project) একটি অঙ্গ। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব ধ্বংস করা এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের পথে পিছন দিক হইতে ইউরোপ অধিকার করা। ১৭৯৮ খৃঃ মে মাসে নেপোলিয়ন মিশর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমুদ্রপথে অগ্রসর হইবার কালে তিনি পথিমধ্যে মাল্টা অধিকার করিলেন এবং ইংরেজ নৌবাহিনীকে ফাঁকি দিয়া মিশরে উপনীত হইলেন। প্রথমেই তিনি পিরামিডের যুদ্ধে শত্রু পক্ষকে বিধ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি এই বিজয়ের ফলভোগ করিতে পারিলেন না। অল্পকাল পরেই আবুকির'বে বা নীলনদের যুদ্ধে ইংরেজ নৌ সেনাপতি নেলসনের হস্তে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সহিত তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। নেপোলিয়ন কার্যতঃ মিশরে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু এই দুঃসাহসিক সেনাপতি এই বিপর্যয়ে ভীত না হইয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সংহত করিয়া সিরিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু একার (আক্রা) অধিকার করিতে ব্যর্থ হইলেন। পুনরায় সাফল্য অসম্ভব বিবেচনা

পিরামিডের যুদ্ধ

নীলনদের যুদ্ধ

করিয়া নেপোলিয়ন সৈন্যবাহিনীকে মিশরে ফেলিয়া রাখিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ডাইরেক্টরীর পতন: নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সময় তাহার অনুপস্থিতিতে ডাইরেক্টরীতে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাইরেক্টরী এবং আইনসভার মধ্যে মতবিরোধ চলিতেছিল। ফলে ফ্রান্সে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় ডাইরেক্টরীর দুইজন সভ্য এবং আইন-সভার 'কয়েকজন ডেপুটিকে বলপূর্বক বহিষ্কার করা হইয়াছিল।

মিশরে নেপোলিয়নের পরাজয়ের সংবাদ ইউরোপে পৌঁছিবামাত্র ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নূতন শক্তিজোট গঠন করিল। ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়াকে লইয়া নূতন শক্তিজোট গঠিত হইল। রুশ সেনাপতি সেভরফ অল্পকালের মধ্যে ইটালী অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসীগণ জার্মানী এবং ইটালী হইতে বহিস্কৃত হইল।

এই বিপর্যয়ের ফলে ডাইরেক্টরীর জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হইয়া গেল। ফ্রান্সের সর্বশ্রেণীর লোক ডাইরেক্টরীর পতন কামনা করিতেছিল। ডাইরেক্টরীর অন্যতম সভ্য সাইয়েস শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। ঠিক এই সময় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নেপোলিয়ন এবং সাইয়েস সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিলেন। (৯ই নভেম্বর ১৭৯৯)। একটি কনসাল সভার (Consulate) হস্তে দেশের শাসনভার এবং শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইল। সাইয়েস, ডুকোজ এবং নেপোলিয়ন এই তিনজন কনসাল নিযুক্ত হইলেন।

কনসুলেট: ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিবার পর সাইয়েস এবং নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রাচীন রোমের ন্যায় কনসুলার শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিলেন। দেশের শাসনভার তিনজন কনসালের হস্তে অর্পণ করা হইল। কনসালগণ সিনেট কর্তৃক দশ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রথম কনসালের উপর অর্পিত হইল। বাকী দুইজন কনসাল শাসনকার্যে প্রথম কনসালকে সাহায্য এবং পরামর্শ প্রদান করিবেন।

আইন প্রণয়নের জন্য তিনটি পৃথক আইনসভার ব্যবস্থা করা হইল। (১) কাউন্সিল অব ষ্টেট, (২) ট্রাইবুনেট, (৩) লেজিসলেটিভ বডি'। সিনেট নামে আর একটি সভা গঠন করা হইল। ইহার সদস্য সংখ্যা হইল যাটজন। ইহারা কনসাল, ট্রাইবুনেট এবং লেজিসলেটিভ বডির সদস্য নির্বাচিত করিত। কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যগণ প্রথম কনসাল কর্তৃক মনোনীত হইত। এই শাসনতন্ত্রে কার্যতঃ প্রথম কনসালকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করা হইল। ফ্রান্সে নামে মাত্র প্রজাতন্ত্র রহিল। রাজতন্ত্রের ন্যায় একটি ব্যক্তি সকল ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। তিনি হইলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

নেপোলিয়নের দ্বিতীয় ইটালী অভিযানঃ নেপোলিয়নের মিশরে অবস্থানকালে যে সকল স্থান ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়াছিল তাহা পুনরাধিকার করিবার জন্য কনসালগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। রাশিয়া ইতিমধ্যে শক্তিজোট পরিত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রিয়াই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নেপোলিয়ন জার্মানীর মধ্য দিয়া অষ্ট্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেনাপতি মোরোকে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে ইটালী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া তিনি পুনরায় সমগ্র ইটালী অধিকার করিলেন (১৮০০)। ইহার কয়েকমাস পরেই মোরো হোয়েনলিণ্ডেনের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করিয়া দ্রুত ভিয়েনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

লুনাভিলার সন্ধি

ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। লুনাভিলার সন্ধি (১৮০১) অনুযায়ী অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ক্যাম্পোফোর্মিও'র সন্ধির সর্তাবলী পুনরায় স্বীকার করিয়া লইলেন এবং পূর্বদিকে রাইন নদী ফ্রান্সের সীমানা স্বীকার করিয়া লইলেন।

আমিয়েন্সের সন্ধি ১৮০২ঃ লুনাভিলার সন্ধির পর একমাত্র ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরোধিতা করিতে লাগিল। কিন্তু ফ্রান্স ছিল স্থলশক্তি এবং ইংলণ্ড নৌশক্তিতে বলীয়ান। সুতরাং কেহই অপর পক্ষকে চূড়ান্ত আঘাত হানিতে পারিল না। ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার জন্য নেপোলিয়নের প্ররোচনায় রাশিয়া

প্রাশিয়া, সুইডেন এবং ডেনমার্ক সশস্ত্র নিরপেক্ষ জোট (Armed Neutrality) গঠন করিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ড কর্তৃক সমুদ্রবক্ষে ফ্রান্সের পণ্যের সন্ধানে নিরপেক্ষ জাহাজগুলির তল্লাসীতে বাধাদান করা। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি নেলসন কোপেনহেগেন কামান দাগিয়া ধ্বংস করিলেন এবং ডেনদের জাহাজ আটক করিলেন। এদিকে রুশ সম্রাট জার পল আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। মিশরে এম্বারক্রম্বি আবুকির যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজিত করিবার পর কায়রোর ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। ইংলণ্ডকে চূড়ান্ত আঘাত হানিতে অসমর্থ হইয়া নেপোলিয়ন সন্ধি স্থাপনের জন্য উন্মুখ হইলেন। রণক্লান্ত ইংলণ্ডও শান্তি চাহিতেছিল। আমিয়েন্সের সন্ধিদ্বারা উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী ইংলণ্ড ফ্রান্স ও তাহার মিত্র রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যার্পণ করিল। ইংলণ্ড মাল্টা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল। অবশ্য সিংহল এবং ত্রিনিদাদ ইংলণ্ডের অধিকারে রহিল। ফ্রান্স নেপলস্ এবং পোপের রাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে এবং তুরস্কের সুলতানের হস্তে মিশর অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল।

সশস্ত্র নিরপেক্ষ জোট

উভয়পক্ষে শান্তির আগ্রহ

আমিয়েন্সের সন্ধি বাস্তবিকপক্ষে নেপোলিয়নের বিরাট সাফল্যের পরিচয়। কারণ ক্যাম্পো ফোর্মিও এবং লুনাভিলার সন্ধির ফলে ইউরোপে ফ্রান্সের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইংলণ্ড পরোক্ষ ভাবে তাহা মানিয়া লইয়াছিল। ফ্রান্স ইউরোপে অধিকৃত অঞ্চলগুলি নিজ অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার অধিকাংশই প্রত্যার্পণ করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ড পরাজিত হয় নাই অথচ আমিয়েন্সের সন্ধির ফলে তাহার কোন লাভ হইল না বরং ক্ষতি হইল। ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এইজন্য এই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

সমালোচনা

শাসক হিসাবে নেপোলিয়নঃ আভ্যন্তরীণ সংস্কারঃ আমিয়েন্সের সন্ধির পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে অগ্রসর হইলেন।

দীর্ঘ দিনের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা এবং রক্তপাতে ফ্রান্সের সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উপশম করিয়া দেশে উন্নত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তিনি বৈষম্য দূর করিয়া সকলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অবাধ 'স্বাধীনতা' দানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কারণ তাহার মতে স্বাধীনতাই ছিল সকল বিশৃংখলা ও রক্তপাতের মূল কারণ। নেপোলিয়ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন।

উদ্দেশ্য

বিপ্লবের যুগে যে সকল 'ডিপার্টমেণ্ট' (প্রদেশ) এবং কমিউন গঠিত হইয়াছিল সেইগুলি এবং অন্যান্য স্বায়ত্ব শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির শাসনকার্য নির্বাচিত প্রতিনিধি সভার দ্বারা পরিচালিত হইত। কিন্তু নেপোলিয়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাহার মনোনীত প্রতিনিধি প্রিফেক্ট বা সাব-প্রিফেক্টদের হস্তে এই সকল প্রদেশ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির শাসনভার অর্পণ করেন। ফলে স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল।

ইহার পর তিনি সকল শ্রেণীর সমর্থন লাভের জন্য বৈষম্য মূলক ব্যবস্থাগুলি বিলুপ্ত করেন। এমিগার, ধর্মযাজক, রাজতন্ত্রী, জিবণ্ডিষ্ট প্রত্যেকেই সমান সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইল। এই ব্যবস্থার ফলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গেল।

বৈষম্য মূলক ব্যবস্থার বিলোপ

অতঃপর চার্চের সহিত সম্পর্কের উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন পোপের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন (১৮০১)। ইহা 'কনকরড্যাট' নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ফ্রান্সের অধিকাংশ জনসাধারণের ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইল। পূর্বে চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হহয়াছিল। পোপ ইহা মানিয়া লইলেন। ফরাসী সরকার যাজক শ্রেণীর ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে নেপোলিয়ন রোমান ক্যাথলিকদের সমর্থনলাভ করিলেন।

চার্চের সহিত সম্পর্ক

চার্চের উপর ক্ষমতা বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নেপোলিয়ন কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। ইহা 'সিভিল কোড' বা'কোড নেপোলিয়ন' নামে পরিচিত। পূর্বে ফ্রান্স বিচিত্র ধরনের এবং বিভিন্ন প্রকারের আইন দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু এই কোড প্রবর্তনের ফলে সমস্ত দেশে একই প্রকার, সরল এবং সুশৃংখল আইন প্রচলিত হইল। আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান বলিয়া পরিগণিত হইল। নেপোলিয়ন 'ব্যাংক অব ফ্রান্স, প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার উন্নতি সাধন করেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন।

নেপোলিয়নের কার্যাবলীর আলোচনা ঃ নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীন সংস্কার সাধনের ফলে সমগ্র ফ্রান্স নূতন ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছিল। ধর্ম রাজনীতি, সমাজ, বিচার, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের তিনি আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে তিনি শান্তি, শৃংখলা এবং আস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই ছিল সমান। শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকেই সরকারী কার্যে যোগদানের সুযোগ দিয়াছিলেন। তাহার সংস্কারের ফলে বিপ্লবের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা

বলা হইয়াছে নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের উত্তরাধিকারী আবার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হইতে সৃষ্ট ("Napoleon showed himself at once the heir of the Revolution and the product of the reaction against it".)। বিপ্লবের মহান আদর্শ অনুযায়ী তিনি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য (Equality) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (Liberty) প্রদানের বিরুদ্ধে ছিলেন। নেপোলিয়ন বলিতেন 'আমিই বিপ্লব' (I am the Revolution)। তাহার এই বক্তব্য আংশিক সত্য। তাহার সংস্কারগুলি বিপ্লবের আদর্শ অনুযায়ী প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিনি কাহাকেও পক্ষপাতিত্ব বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। কর্মক্ষমতা অনুযায়ী সকলকে সমান সুযোগ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মত প্রকাশের

বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ

স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা এবং স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। নির্বাচন অপেক্ষা মনোনয়ন দানের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহা ফ্রান্সের পুরানো শাসনব্যবস্থাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইদিক হইতে বিচার করিলে তিনি বিপ্লবের ধ্বংসকারী বলিয়া প্রতিভাত হইবেন। জনকল্যাণ মূলক কার্য, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করা, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা—সব কিছুর মধ্যে চতুর্দ্দশ লুই ও কোলবার্টের নীতির অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়।

পুরাতন শাসন ব্যবস্থার সহিত সংস্কার সমূহের মিল

ফ্রান্সের সম্রাটপদে নেপোলিয়ন ঃ নেপোলিয়ন একদা বলিয়াছিলেন "আমি ফ্রান্সের রাজমুকুট ভূমিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম এবং আমি উহা তরবারির সাহায্যে কুড়াইয়া লইয়াছি"। বাস্তবিক পক্ষে ইটালী অভিযানের পর হইতে তিনি যে দ্রুত ও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার ফলে তিনি ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রথম বা প্রধান কনসাল নিযুক্ত হইবার ফলে তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। আভ্যন্তরীন সংস্কার প্রবর্তন করিবার ফলে তিনি সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। 'লিজিয়ন অব অনার' বা সর্বোচ্চ সম্মান দানের পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে, তাহার অনুগত এক নূতন অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ১৮০২ খৃঃ আজীবন কনসাল নিযুক্ত হইবার ফলে তিনি সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হন। অবশেষে ১৮০২ খৃঃ মে মাসে তাহার বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীদের এক ষড়যন্ত্রের সুযোগে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করিয়া

নেপোলিয়ন

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এক গণভোটের দ্বারা শাসনতন্ত্রের এই পরিবর্তন আইনসিদ্ধ করিয়া লওয়া হইল।

নেপোলিয়নের জীবনী: আমিয়েন্সের সন্ধি (১৮০৩) হইতে টিলজিটের (১৮০৭) সন্ধি পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ: আমিয়েন্সের সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ফ্রান্সে আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ফ্রান্সের শক্তি এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নেপোলিয়ন সাময়িক শান্তি চাহিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডকে ধ্বংস করা এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। সুতরাং নিজের শক্তি সংহত করিবার পর নেপোলিয়নের ইংলণ্ডের সহিত শান্তির প্রয়োজন ছিল না। ইংলণ্ডও আমিয়েন্সের সন্ধির শর্তাবলীতে লাভবান হয় নাই। বরং ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষতি হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ধারণা ছিল ফ্রান্সের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। কিন্তু নেপোলিয়ন যখন ইংলণ্ডের বাণিজ্য ধ্বংস করিবার জন্য উচ্চহারে শুল্ক প্রবর্তন করিলেন তখন ইংলণ্ড বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ন স্পেনের নিকট হইতে আমেরিকায় লুসিয়ানা ক্রয় করিলেন এবং সেখানে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তিনি পিডমণ্ট অধিকার করিলেন; সুইজারল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং হল্যাণ্ড প্রায় ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। নেপোলিয়নের এই আক্রমণাত্মক কার্যাবলীতে ভীত হইয়া ইংলণ্ড নেপোলিয়নকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রান্সে বুরবন রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যড়যন্ত্র করিতে লাগিল। প্রাচ্যে ইংলণ্ডের স্বার্থ বিপন্ন করিবার জন্য নেপোলিয়ন ভারতে ও মিশরে একটি করিয়া প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ইহাতে ভীত ও ক্রুদ্ধ ইংলণ্ড আমিয়েন্সের সন্ধির সর্ত অনুযায়ী মাণ্টা পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইল। ১৮০৩ খৃঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আমিয়েন্সের সন্ধি ব্যর্থ হইবার কারণ

নেপোলিয়ন প্রথমেই জার্মানীতে ইংলণ্ডের অধিকৃত অঞ্চল হানোভার অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ড বিজয়ের জন্য বিপুল সৈন্য

সমাবেশ করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত যুদ্ধ জাহাজের অভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারিলেন না। ১৮০৫ খৃঃ ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিলেন। নেপোলিয়নের ইংলণ্ড বিজয়ের আশা চিরতরে বিনষ্ট হইল। নেপোলিয়নের শক্তি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তি জোট গঠন করিল। কিন্তু এই শক্তি জোটকে চূর্ণ করিবার জন্য নেপোলিয়ন তাহার বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অষ্টারলিজের যুদ্ধে (১৮০৫) নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে অপমানজনক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধি প্রেসবার্গের সন্ধি নামে খ্যাত। অষ্ট্রিয়া জার্মানীতে তাহার অধীন ব্যাভেরিয়া ও উরটেমবার্গ রাজ্য দুইটির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল এবং ভেনিস ইটালীকে ও টিরল ব্যাভেরিয়াকে অর্পণ করিল।

ট্রাফালগারের যুদ্ধ

অষ্টারলিজের যুদ্ধ

প্রেসবার্গের সন্ধি

নেপোলিয়নের রাজনৈতিক সৃষ্টি ঃ অষ্টারলিজের যুদ্ধের পূর্বেই নেপোলিয়ন সিসেলপাইন প্রজাতন্ত্রকে ইটালীতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন এবং নিজেকে ইটালীর রাজা ঘোষণা করিয়াছিলেন। অষ্টারলিজের যুদ্ধের পর বাটাভিয়া প্রজাতন্ত্রকে হল্যাণ্ডে পরিবর্তন করিলেন এবং এক ভ্রাতা লুই বোনাপার্টকে হল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসাইলেন। আর এক ভ্রাতা জোসেফকে নেপল্‌সএর সিংহাসনে বসান হইল। যেহেতু ফ্রান্সে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেইহেতু অধীন প্রজাতন্ত্রগুলিকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা হইল।

জার্মানীর পুনর্গঠন ঃ জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার শক্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন জার্মানীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই রাষ্ট্রগুলিকে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মিত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। জার্মানীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে কমাইয়া অনেকগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি করিলেন। ফলে জার্মানীর রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হইল।

অতঃপর নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ, ব্যাডেন এবং অন্যান্য তেরটি রাষ্ট্র একত্রিত করিয়া রাইন রাষ্ট্রসংঘ (Confederation of the Rhine) গঠন করিলেন। এই রাষ্ট্রগুলি পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের (অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য) প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করিল। নেপোলিয়নকে রক্ষাকর্তা বলিয়া স্বীকার করিল এবং সকল যুদ্ধে ৬৩,০০০ সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এই রাষ্ট্রসংঘের সীমানার মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে বৃহৎ রাজ্যগুলির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে জার্মানীতে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার প্রভাব বিনষ্ট করা হইল। রাইন রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইবার ফলে সুপ্রাচীন পবিত্র রোম সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যই ছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্য, যদিও এই সাম্রাজ্যের কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। নেপোলিয়ন কর্তৃক ইটালী ও জার্মানী পুনর্গঠন, ভবিষ্যতে এই দুই রাষ্ট্রের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল।

রাইন রাষ্ট্রসংঘ

পবিত্র রোম সাম্রাজ্য বিলুপ্ত

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ বেসেনের সন্ধির (১৭৯৫) পর প্রায় দশবৎসর যাবৎ প্রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু নেপোলিয়ন কর্তৃক জার্মানী পুনর্গঠিত হইবার ফলে প্রাশিয়া ভীত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের প্রাশিয়া বিরোধী নীতির ফলে প্রাশিয়ার ধৈর্যচ্যুতি হইল। তদুপরি প্রকাশ পাইল যে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হ্যানোভার প্রাশিয়ার হস্ত হইতে ইংলণ্ডকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং প্রাশিয়া নেপোলিয়নের কার্যে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়াকে সাহায্য প্রেরণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং নেপোলিয়ন সহজেই প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে জেনা এবং অরষ্ট্যাড এর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে বার্লিন প্রবেশ করিলেন।

জেনা এবং অরষ্ট্যাডের যুদ্ধ

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ অতঃপর নেপোলিয়ন রাশিয়াকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। ইয়েলাউ এর যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে না পারিলেও নেপোলিয়ন ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে

(১৮০৭) রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া জার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। রাশিয়াকে কোন অঞ্চল অর্পন করিতে হইল না। কিন্তু প্রাশিয়ার প্রায় অর্ধাংশ নেপোলিয়নকে অর্পন করিতে হইল। এই অঞ্চলগুলিকে দুইটি রাজ্যে পরিণত করা হইল; পশ্চিমে ওয়েষ্ট ফেলিয়া রাজ্য গঠন করিয়া তাহার সিংহাসনে নেপোলিয়নের ভ্রাতা জেরোমকে বসান হইল এবং পূর্বের অঞ্চল স্যাকসনির শাসনকর্তাকে প্রদান করা হইল। প্রাশিয়া একটি ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যে পরিণত হইল। রাশিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল। এই দুইটি রাষ্ট্র এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী তাহারা ইউরোপকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভুত্ব বিস্তারে পরস্পরকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। টিলজিটের সন্ধির ফলে নেপোলিয়ন সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করিলেন। সমগ্র ইউরোপ তাহার পদানত হইল।

ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধ

টিলজিটের সন্ধি

টিলজিটের সন্ধি হইতে ওয়াটারলুর যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ (১৮০৭-১৫): নেপোলিয়নের অপ্রতিহত ক্ষমতা: সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার: টিলজিটের সন্ধি নেপোলিয়নের চূড়ান্ত সাফল্যের পরিচয়। খুশীমত তিনি ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছিলেন। ইউরোপের মানচিত্র বারংবার পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ফ্রান্সের সম্রাট, ইটালীর রাজা; রাইন রাষ্ট্রসংঘের রক্ষাকর্তা; জার্মানীতে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী, সুইজারল্যাণ্ড তাহার ইচ্ছাধীন; হল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ফেলিয়া এবং নেপলস্'এর সিংহাসনে তাহার তিন ভ্রাতা, ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী অধীন রাজ্যগুলি তাহার আত্মীয়-বর্গের শাসনাধীন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত; রাশিয়া মিত্র রাষ্ট্র। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ছিল ফ্রান্সের শত্রু। সুতরাং নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইউরোপে অপ্রতিহত ক্ষমতা

১৮১১ খৃঃ একমাত্র রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপ

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৮১০ খৃঃ তিনি ভ্রাতা লুইকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইংলণ্ডের সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাহত করিবার জন্য বাল্টিক পর্যন্ত উত্তর জার্মানীর বিরাট অঞ্চল অধিকার করিলেন। ভূমধ্য সাগরে ইংলণ্ডের বাণিজ্য নষ্ট করিবার জন্য ইটালীতে টাসকেনি এবং জেনোয়া অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি স্পেনের অধিকৃত অঞ্চলগুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভেনিসিয়া, লোম্বার্ডি এবং পোপের রাজ্যগুলির পূর্বাঞ্চল লইয়া গঠিত ইটালী রাজ্যের রাজা ছিলেন নেপোলিয়ন নিজে। নেপলস্'এর সিংহাসনে প্রথমে ছিলেন তাহার ভ্রাতা জোসেফ, পরে সিংহাসনে বসান হইল নেপোলিয়নের এক আত্মীয়কে। জোসেফকে বসান
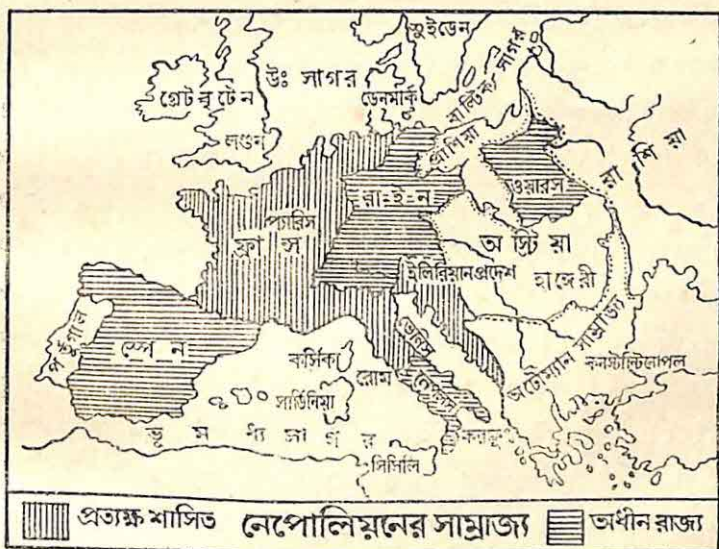
নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য

হইল স্পেনের সিংহাসনে। পর্তুগালেও তাহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। জার্মানী তাহার পদানত। আড্রিয়াটিক সাগরে ইলিরিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। সমগ্র ইউরোপ একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাধীন হইল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ; (১) সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্সের

আদর্শ ও ভাবধারা এবং শাসন পদ্ধতি ছড়াইয়া পড়িল ; (২) জার্মানী এবং ইটালী পুনর্গঠিত হইয়াছিল—শাসনতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম হইয়াছিল ; (৩) সমগ্র ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার ফলে ফরাসী প্রভাব ও আদর্শ এমন গভীর ভাবে বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করিয়াছিল যে নেপোলিয়নের পতনের পর যে নূতন ইউরোপ জন্মলাভ করিয়াছিল তাহা এই আদর্শ ও চিন্তাধারার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং নেপোলিয়নের কৃতিত্বের ফলেই পুরাতন ইউরোপের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে নূতন ইউরোপের জন্ম হইয়াছিল।*

সাম্রাজ্য বিস্তারের ফল

মহাদেশীয় ব্যবস্থা (Continental System) : ইউরোপ তাহার পদানত হইলেও নেপোলিয়ন অনুভব করিয়াছিলেন যে শক্তিশালী নৌ-বাহিনী না থাকায় তাহার পক্ষে সরাসরি ইংলণ্ড আক্রমণ সম্ভব নহে। এইজন্য তিনি সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল বাণিজ্যিক রাষ্ট্র ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া তাহাকে পঙ্গু করিবার জন্য বার্লিন হইতে একাধিক ঘোষণা দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত সকল বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলেন। ইংলণ্ডও ইহার প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স ও তাহার অনুগত রাষ্ট্রগুলির সহিত সকল বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিল। এই ঘোষণার পর ১৮০৭ খৃঃ নেপোলিয়ন মিলান হইতে ঘোষণা করিলেন যে কোন দেশের কোন জাহাজ যদি ইংলণ্ডের কোন বন্দরে বাণিজ্য করে তাহা হইলে তাহা ধরিয়া বাজেয়াপ্ত করা হইবে। নেপোলিয়নের বার্লিন ও মিলান ঘোষণাই বিখ্যাত মহাদেশীয় ব্যবস্থা বা কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম্। কিন্তু নেপোলিয়মের কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম্ ব্যর্থ হইল। কারণ ইংলণ্ড ছিল অপরাজেয় নৌ-শক্তির অধিকারী। সুতরাং সমুদ্রে একাধিপত্য থাকায় উপনিবেশগুলির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য এবং রসদ

---

* সুতরাং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের আদর্শ বিরোধী নহে—বিপ্লবের বিস্তৃতি। ইহা বিপ্লবের শেষ অধ্যায়। "Napoleonic Empire was not an interruption but an extension of the Revolution. It was the last phase of the Revolution"—Guedalla

সংগ্রহের কোন অসুবিধা হইল না। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা বাণিজ্য বিনষ্ট হইল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়া গেল। ফলে নেপোলিয়নের শাসনের বিরুদ্ধে অধীন রাষ্ট্রগুলির বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল। মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া নেপোলিয়ন মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন।

ব্যর্থতা

নেপোলিয়ন এক গোপন চুক্তির দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে ডেনমার্ক এবং সুইডেন এই দুইটি বাল্টিক রাষ্ট্র ইংলণ্ডের মহাদেশীয় ব্যবস্থায় যোগদান করিবে। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া ইংলণ্ড এক শক্তিশালী নৌ-বহর প্রেরণ করিয়া ডেনমার্কের নিকট তাহার যুদ্ধ জাহাজগুলি সমর্পণ করিবার দাবী জানাইল। ইংলণ্ডের ভয় হইয়াছিল যে এই জাহাজগুলি ভবিষ্যতে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে। ডেনমার্ক অসম্মত হওয়ায় ইংরেজ নৌ-বহর কামানের গোলায় কোপেনহেগেন ধ্বংস করিল এবং ডেনমার্কের নৌ-বহর বলপূর্বক ইংলণ্ডে আনয়ন করিল।

ইংলণ্ড কর্তৃক ডেনমার্কের যুদ্ধ জাহাজ অধিকার

পেনিনসুলার যুদ্ধ ঃ বাল্টিক সাগর অঞ্চলে ব্যর্থ হইয়া নেপোলিয়ন স্পেন ও পর্তুগালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পর্তুগাল ছিল ইংলণ্ডের মিত্র রাষ্ট্র। তিনি পর্তুগালের নিকট তাহার বন্দরগুলির সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিবার দাবী জানাইলেন। কিন্তু পর্তুগাল এই দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকার করায় নেপোলিয়ন স্পেনের সহিত ফাউন্টেনব্লিউ'এর সন্ধি দ্বারা স্থির করিলেন যে পর্তুগাল ও তাহার উপনিবেশ গুলি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইবে। অতঃপর স্পেনের সহযোগিতায় ফরাসী সেনাপতি জুনোট পর্তুগাল অধিকার করিলেন। পর্তুগালের রাজপরিবার ইংরেজ নৌ-বহরের সহযোগিতায় ব্রাজিলে পলায়ন করিল।

নেপোলিয়নের পর্তুগাল অধিকার

অতঃপর নেপোলিয়ন স্পেন অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জুনোটের নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী কয়েকটি স্পেনীয় ঘাঁটি অধিকার করিয়াছিল। ইহার পর স্পেনের রাজা চতুর্থ চার্লস এবং তাহার

পুত্র ফার্ডিনাণ্ডের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া তিনি বিরোধ মীমাংসা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উভয়কে তাহার নিকট আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা নেপোলিয়নের নিকট উপনীত হইলে তিনি বিশ্বাসঘাতকা করিয়া তাহাদের বন্দী করেন এবং বলপূর্বক সিংহাসনের উপর দাবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর নিজ ভ্রাতা জোসেফকে তিনি স্পেনের সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু সকল নীতি ও ন্যায়বিচার পদদলিত করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে একটি জাতিকে পদানত করিতে যাইয়া নেপোলিয়ন জীবনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবার জন্য সমগ্র জাতি ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ইতিপূর্বে নেপোলিয়ন একাধিক সম্রাট ও রাজাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রথম তাহাকে একটি জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইল। স্পেনের প্রদেশে প্রদেশে প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হইল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিল। এই জাতীয় অভ্যুত্থান দমন করা অসম্ভব ছিল। ১৮০৮ খৃঃ সমগ্র ইউরোপকে বিস্মিত করিয়া বেলিন'এ ফরাসী বাহিনী স্পেনীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ইতিমধ্যে স্পেন ইংলণ্ডের নিকট দ্রুত সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইল। জোসেফ মাদ্রিদ হইতে পলায়ন করিলেন। স্পেনের সাহায্যার্থে ইংরেজ সেনাপতি স্যার আর্থার ওয়েলেসলী (পরবর্তী কালে ডিউক অব ওয়েলিংটন) সসৈন্যে স্পেনে অবতরণ করিলেন। পেনিনসুলার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনতিবিলম্বে ওয়েলেস্‌লী লিসবন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভিমেরোর যুদ্ধে ওয়েলেসলীর নিকট পরাজিত হইয়া ফরাসী সেনাপতি জুনোট পর্তুগাল পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। বেলিন এবং ভিমেরোর পরাজয়ে উদ্বিগ্ন নেপোলিয়ন ঝড়ের বেগে স্পেনে প্রবেশ করিলেন। ইহার পূর্বে তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী সুদৃঢ়

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্পেনের রাজাকে বন্দী

নেপোলিয়নের ভুল

স্পেনের জাতীয় অভ্যুত্থান

ইংল্যাণ্ড কর্তৃক স্পেনকে সাহায্য

ভিমেরোর যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়

করিয়া লইয়াছিলেন। একাধিক যুদ্ধে স্পেনের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া তিনি মাদ্রিদে প্রবেশ করিলেন এবং পুনরায় জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইলেন। ইহার পর স্যার জন মুরের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভীত হইয়া মুর পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার আক্রমণাত্মক কার্য প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

স্পেনে নেপোলিয়ন

এদিকে টালাভেরার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ওয়েলেসলী মাদ্রিদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ ওয়েলেসলী ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ওয়াগ্রামের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিবার পর নেপোলিয়ন তাহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ম্যাসেনাকে স্পেনে প্রেরণ করিলেন। সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ওয়েলিংটন এক রক্ষণ ব্যূহ নির্মান করিলেন। ম্যাসেনা একের পর এক দুর্গ অধিকার করিলেও ইংরেজদের রক্ষণ ব্যূহ ভাঙ্গিতে ব্যর্থ হইয়া স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পরই ওয়েলিংটন আলমেডিয়া অবরোধ করিলেন এবং ম্যাসেনাকে পরাজিত করিলেন।

টালাভেরার যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়

১৮১২ খৃঃ ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধের সুযোগ লইয়া ওয়েলিংটন একটির পর একটি অঞ্চল অধিকার করিতে লাগিলেন। সালামাঙ্কার যুদ্ধে তিনি ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিলেন। ফরাসী সেনাপতি সাউল্ট তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া জার্মানীর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য স্পেন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে ওয়েলিংটন ভিতোরিয়ার যুদ্ধে জোসেফকে পরাজিত করিলেন। এই ভাবে স্পেনে ফরাসী শক্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া ওয়েলিংটন পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলেন। তিনি বেয়ন অবরোধ করিলেন এবং ফরাসী বাহিনীকে তুলোজ পর্যন্ত বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরাজিত নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং পেনিনসুলার যুদ্ধের অবসান হইল।

সালামাঙ্কায় ফ্রান্সের পরাজয়

যুদ্ধের অবসান

অস্ট্রিয়ার বিদ্রোহ : স্পেনে জাতীয় অভ্যুত্থানের সুযোগ লইয়া অষ্ট্রিয়া জার্মানদের বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগঠিত হইবার পূর্বেই ওয়াগ্রামের যুদ্ধে অষ্ট্রিয় বাহিনী পরাজিত হইল (১৮০৯)। স্কনবার্ণের সন্ধি দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধের বাবদ প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইল এবং কয়েকটি অঞ্চল ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে হইল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত নিজ কন্যা মেরিয়া লুসিয়ার বিবাহ প্রদান করিলেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান : টিলজিটের সন্ধির সময় হইতে রাশিয়া ছিল ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্র। কিন্তু শীঘ্রই এই মিত্রতায় ভাঙ্গন দেখা দিল।

রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধের কারণ

নেপোলিয়নের সহিত অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীর বিবাহ জার সুনজরে দেখেন নাই। নেপোলিয়ন কর্তৃক ওল্ডেনবার্গ অধিকার এবং 'গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ' নামক রাজ্য সৃষ্টি জারের ক্রোধের কারণ হইয়াছিল। জারের ধারণা হইয়াছিল নেপোলিয়ন পুনরায় পোল্যাণ্ড রাজ্য গঠন করিতে চাহিতেছেন এবং পোলদিগকে জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য উস্কানি দিতেছেন। নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি হইতেছিল। ১৮১০ খৃঃ জার 'মহাদেশীয় ব্যবস্থার' প্রতি তাহার সমর্থন প্রত্যাহার করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নেপোলিয়ন বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নেপোলিয়ন রুশ বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ানরা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করিয়া ক্রমাগত দেশের অভ্যন্তরে পশ্চাদাপসরণ করিতে লাগিল। পশ্চাদাপসরণ কালে তাহারা ঘরবাড়ী পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিল, শস্য বিনষ্ট করিল, পানীয় জল

মস্কো অভিযান

বিষাক্ত করিয়া দিল, যাহাতে ফরাসী সৈন্যবাহিনী কোন প্রকার সাহায্য না পায়। কিন্তু সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বরদিনোর যুদ্ধে রুশদের পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন মস্কো প্রবেশ করিলেন (১৮১২)। কিন্তু রুশগণ পূর্বেই মস্কো পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এবং সমগ্র সহরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। নেপোলিয়ন

পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। পথে শীত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং কোজাক গেরিলা সৈন্যদের আক্রমণে তাহার বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রায় ধ্বংস হইল। মাত্র অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ নেপোলিয়ন কোনক্রমে ফ্রান্সে উপনীত হইলেন। এই বিপর্যয়ে নেপোলিয়নের সামরিক খ্যাতি ম্লান হইয়া গেল এবং মধ্য ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। প্রাশিয়া প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

নেপোলিয়নের বিপর্যয়

প্রাশিয়ার পুনরভ্যুদয়ঃ মুক্তি সংগ্রাম ১৮১৩ঃ জেনার যুদ্ধে পরাজয়ের পর হইতে প্রাশিয়া নেপালিয়নের পদানত হইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়া অভিযানে নেপোলিয়নের শোচনীয় বিপর্যয়ের সংবাদে তাহার শত্রুদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বহিয়া গেল। এই সুযোগে প্রাশিয়া নেপোলিয়নের আধিপত্য মুক্ত হইবার জন্য এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। জনসাধারণের চাপে পড়িয়া দুর্বল এবং ভীতু রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম 'ক্যালিচ'এর সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উৎসাহিত হইয়া প্রাশিয়ার রাজা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানাইলেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সমগ্র জাতি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ফরাসীগণ বার্লিন ও ড্রেসডেন হইতে বিতাড়িত হইল। কিন্তু এই বিপর্যয়ে ভীত না হইয়া নেপোলিয়ন দ্রুত এক সৈন্যদল গঠন করিলেন এবং লুটজেন ও বটজেনের যুদ্ধে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের জন্য নেপোলিয়ন সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই অবসরে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত যোগদান করিল। সুইডেনও এই শক্তিজোটে যোগদান করিল। সুতরাং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চতুর্থ শক্তিজোট গঠিত হইল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত শক্তিজোটের নিকট পরাজিত হইতে লাগিল। তবুও ড্রেসডেনের যুদ্ধে

রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী, ক্যালিচের সন্ধি

রাশিয়া, প্রাশিয়ার পক্ষে অস্ট্রিয়ার যোগদান

নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। লাইপজিগ নামক স্থানে তিন দিন ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন। জার্মাণীতে নেপোলিয়নের আধিপত্য বিনষ্ট হইল। রাইন রাষ্ট্রসংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; হল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল এবং নেপোলিয়নের সৃষ্ট ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্য বিনষ্ট হইল। ব্যাভেরিয়া মিত্র পক্ষে যোগদান করিল। ভগ্ন হৃদয়ে নেপোলিয়ন অবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া জার্মাণী পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়

নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ ১৮১৪ খৃঃঃ রাইন, আল্পস এবং পিরেনীজ ফ্রান্সের সীমারেখা—এই ভিত্তিতে মিত্র শক্তিবর্গ নেপোলিয়নকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাইল। কিন্তু নেপোলিয়ন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যদল ফ্রান্সে প্রবেশ করিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্যদল লইয়া নেপোলিয়ন অগনিত শত্রু সৈন্যের আক্রমণ নয় সপ্তাহ প্রতিরোধ করিলেন। প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুচার বারংবার তাহার নিকট পরাজিত হইল। বিপর্যয়ের মধ্যেও ইহা নেপোলিয়নের বিস্ময়কর সামরিক প্রতিভার পরিচয়। চৌমণ্টের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স পরাজিত ও বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত একত্রে অবিরাম যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ধীরে ধীরে মিত্র সৈন্যদল প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইল। অগণিত শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। দুর্দিনে তাহার প্রিয় সেনাপতিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। ৩০শে মার্চ (১৮১৪) মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করিল। নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ফণ্টেনব্লিউ'র সন্ধি দ্বারা তিনি ইউরোপে স্বীয় আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে চলিয়া গেলেন। একদা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা নেপোলিয়ন ক্ষুদ্র এলবা দ্বীপের অধীশ্বর হইলেন। প্রথম প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্সের পূর্বতন

নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ; এলবা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ

রাজার ভ্রাতা বুরবন বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসান হইল। ১৭৯২ খৃঃ ফ্রান্সের যে রাজ্য সীমা ছিল তাহাই ফ্রান্সের সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল।

অতঃপর ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গ ভিয়েনায় এক সম্মেলনে মিলিত হইল। কিন্তু ভাগ বাটোয়ারা লইয়া শক্তিগুলির মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে ফরাসী জনগণও অষ্টাদশ লুইয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন আর একবার ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন (১৮১৫ খৃঃ)।

ভিয়েনা সম্মেলন

নেপোলিয়নের এলবা পরিত্যাগ: ওয়াটারলুর যুদ্ধ: ১৮১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে নেপোলিয়ন গোপনে এলবা দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলেন। ফরাসী জনগণ তাহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানাইল। ভীত সম্রাট অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স হইতে পলায়ন করিলেন। আনন্দে উন্মত্ত জনতার সঙ্গে নেপোলিয়ন প্যারিসে প্রবেশ করিলেন।

এই সংবাদে ভিয়েনায় ভাগাভাগিতে ব্যস্ত শক্তিবর্গ নিজেদের বিভেদ বিস্মৃত হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মাণ হইল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অবিলম্বে দুইটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইল। একটি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ব্লুচার এবং অপর বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ওয়েলিংটন। মিত্র পক্ষের তুলনায় নেপোলিয়নের সৈন্যদল ছিল ক্ষুদ্র; কিন্তু লিজানের যুদ্ধে তিনি ব্লুচারকে পরাজিত করিলেন। তাহার সেনাপতি নে ওয়েলিংটনের অভিযান প্রতিহত করিলেন। অতঃপর ওয়াটারলু'র রণক্ষেত্রে ওয়েলিংটন সাতঘণ্টা ব্যাপী নেপোলিয়নের অবিশ্রান্ত আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। হয়ত নেপোলিয়ন ওয়েলিংটনকে পরাজিত করিতে পারিতেন কিন্তু সন্ধ্যার একটু পূর্বে ব্লুচার প্রাশিয়ার সৈন্যদল লইয়া ওয়েলিংটনের সাহায্যার্থে উপনীত হইলেন। নেপোলিয়ন পরাজিত হইয়া (১৮১৫) প্যারিসে পলায়ন করিলেন এবং দ্বিতীয়বার সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। অতঃপর জাহাজ যোগে আমেরিকায় পলায়নের উদ্দেশ্যে তিনি

ওয়াটারলুর যুদ্ধ

সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু ইংরেজদের নিকট সুবিচারের আশায় তিনি একটি ইংরেজ জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট আত্মসমর্পন করিলেন। অতঃপর বন্দী নেপোলিয়নকে বিপদ সংকুল এবং অস্বাস্থ্যকর সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হইল। সঙ্গে মাত্র কয়েকজন অনুচর দেওয়া হইল। ছয়বৎসর পরে (১৮২১) নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবিস্মরণীয় সামরিক খ্যাতির অধিকারী, একদা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা নেপোলিয়নের কর্মবহুল জীবনের কি দুঃখজনক পরিনতি!

সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্বাসন

নেপোলিয়নের পতনের কারণ ঃ নেপোলিয়নের পতনের প্রথম কারণ হইল তাহার গগণচুম্বী উচ্চাশা। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা যে অসম্ভব ছিল তাহা তিনি বিচার করিয়া দেখেন নাই। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া সমগ্র ইউরোপের সহিত তাহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ যে সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি ছিল দুর্বল। নিজ প্রতিভা এবং সামরিক শক্তির জোরে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কখনও বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীগণের আনুগত্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং যখন তাহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিল তখন সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল।

উচ্চাশা

সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তি

ইহা ছাড়া নেপোলিয়ন কতকগুলি গুরুতর ভুল করিয়াছিলেন প্রথমতঃ তাহার 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা'র ফলে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের কোন গুরুতর সংকট হয় নাই। কারণ সমুদ্রে ইংলণ্ড অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের মিত্র রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছিল। জিনিষ পত্রের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়া ছিল, ফলে নেপোলিয়নের শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। পোপের সহিত বিরোধ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান, পর্তুগাল অধিকার, স্পেনের সহিত যুদ্ধ, সবই মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য

মহাদেশীয় ব্যবস্থা

বল প্রয়োগের ফল। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা নিজ ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসান মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। স্পেনের যুদ্ধ তাহার বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছিল এবং স্পেনের সাফল্য অন্যান্য রাষ্ট্রকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ স্পেনের সহিত তাহার বিরোধের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিকগণ তাহার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। চতুর্থতঃ রাশিয়া অভিযানের ব্যর্থতা তাহার পতনের অন্যতম কারণ। রাশিয়া অভিযানে তাহার বিরাট সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিজোট গঠিত হইয়াছিল। এই শক্তি জোটের নিকট ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে তাহার চূড়ান্ত বিপর্যয় হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ ইংলণ্ড ছিল নেপোলিয়নের প্রধান শত্রু। ইংলণ্ডের ক্রমাগত বিরোধিতা এবং তাহার অপ্রতিহত নৌশক্তি নেপোলিয়নের পতনের একটি প্রধান কারণ।

স্পেন নীতি

পোপের সহিত বিরোধ

রাশিয়া অভিযান

ইংলণ্ডের নৌশক্তি

নেপোলিয়নের সমালোচনা : পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক এবং শাসকদের মধ্যে নেপোলিয়ন অন্যতম। তিনি আলেকজাণ্ডার, সীজার এবং শার্লামেনের সমগোত্রীয়। সমগ্র ইউরোপের শক্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করা তাহার অবিস্মরণীয় এবং অম্লান সামরিক প্রতিভার পরিচয়। ফ্রান্সে শান্তি, শৃংখলা এবং সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাহার আভ্যন্তরীণ সংস্কার, সিভিল কোড্ প্রবর্তন তাহার শাসন প্রতিভার পরিচয়। সামাজিক জীবনে এবং শাসন ব্যবস্থায় তিনি সকল ভেদাভেদ দূর করিয়া সাম্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন উদার স্বৈর শাসক। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পোপের সহিত তাহার চুক্তির ফলে তিনি রোমান ক্যাথলিকদের সমর্থন পাইয়াছিলেন।

উদার স্বৈরশাসক

ইউরোপের প্রতি তাহার অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেখানেই তিনি নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেখানে সাম্যের উপর ভিত্তি করিয়া

সমাজ ও আইন পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নেপোলিয়নের পতন হইয়াছিল কিন্তু সামন্ত শ্রেণীর আধিপত্য ও দুর্নীতিগ্রস্থ আইনের অবসান করিয়া মধ্য যুগের ইউরোপের ধ্বংসের মধ্য হইতে যে নূতন ইউরোপ গড়িয়া উঠিয়া ছিল তাহার অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে নেপোলিয়ন ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ইটালীও জার্মাণীর পুনর্গঠন করিয়া তিনি ভবিষ্যতে ইটালী ও জার্মাণীতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

ইউরোপের প্রতি অবদান

বিপ্লবের আদর্শ অনুযায়ী নেপোলিয়ন সাম্যের (Equality) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ দূর করিয়া তিনি শাসন-কার্যে সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন জনসাধারণকে অবাধ স্বাধীনতা (Liberty) প্রদানের বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বায়ত্ব শাসনশীল প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং প্রদেশের শাসন ক্ষমতা হরণ করিয়া শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

বিপ্লবের প্রতি মনোভাব

নেপোলিয়নের ন্যায় বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের কৃতিত্ব নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। কারণ তাহার জীবনের ও চরিত্রের বহু ঘটনাবলী লইয়া পরস্পর বিরোধী মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেহ তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন আবার কেহ তাহাকে পররাজ্যলোভী রক্তপিপাসু এবং নিষ্ঠুর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নেপোলিয়ন পররাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, লুণ্ঠন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ এবং প্রাশিয়ার মহাবীর ফ্রেডারিকও নির্লজ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

পরস্পর বিরোধী মত

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল: ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র ফ্রান্সের ঘটনা নহে। বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর বিপ্লবের আদর্শ সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল। মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর অবসান হইয়াছিল। স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী ফ্রান্সের ভৌগলিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র ইউরোপে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিখ্যাত 'অধিকারের ঘোষণা'য় (Declaration of Rights) প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ক্রমে সার্ফ বা চাষীগণ, অভিজাত ও ভূস্বামীদের শোষণমুক্ত হইয়াছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হইবার ফলে বিশেষ শ্রেণী এবং ব্যক্তির রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে জন-সাধারনের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে পার্লামেণ্ট গঠিত হইয়াছিল। সমাজের প্রত্যেককে সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী হইয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হইল জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়। নেপোলিয়নের পতনের পর বেলজিয়াম ইটালী, জার্মানী এবং বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের বিজয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজিও শৃংখলিত ও পদানত মানুষের আশার বাণী।

ফ্রান্সে বুরবনবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর অষ্টাদশ লুইকে পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে বসান হইল। দ্বিতীয় প্যারিসের সন্ধির সর্ত অনুযায়ী ফ্রান্স প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল এবং নেপোলিয়ন বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে যে সকল শিল্পকার্য ফ্রান্সে আনয়ন করিয়া-ছিলেন তাহা প্রত্যার্পন করা হইল। অতঃপর বিজয়ী শক্তিবর্গ ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য ভিয়েনা সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৭৬৩ প্যারিসের সন্ধি ; সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান।
১৭৬৫ আমেরিকায় স্ট্যাম্প এ্যাক্ট প্রবর্তন।
১৭৬৭ নূতন শুল্ক প্রবর্তন।
১৭৭৩ বোষ্টন বন্দরে সমুদ্রে চা'এর বাক্স নিক্ষেপ।

১৭৭৫-৮৩ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৭৭৬ আমেরিকার স্বাধানতা ঘোষণা।

১৭৮৩ ভার্সাই সন্ধি।

১৭৮৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

১৭৮৯ ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই কর্তৃক স্টেটস্-জেনারেল আহ্বান, ব্যাষ্টিলের পতন।

১৭৯২ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা; সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড; জাতীয় মহাসম্মেলন; ফরাসী প্রজাতন্ত্র।

১৭৯৩ ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড; প্রথম শক্তিজোট; জিরোণ্ডিষ্টদের পতন।

১৭৯৫ বেসেল'এর সন্ধি; প্রথম শক্তিজোটে ভাঙ্গন।

১৭৯৭ নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান; ক্যাম্পোফোর্মিও'র সন্ধি।

১৭৯৮ দ্বিতীয় শক্তিজোট: মিশরে নেপোলিয়ন, নীলনদের যুদ্ধ।

১৭৯৯ ডাইরেক্টরীর পতন: কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠা; রাশিয়ার শক্তিজোট ত্যাগ।

১৮০১ লুনাভিলার সন্ধি: দ্বিতীয় শক্তিজোটের অবসান।

১৮০২ আমিয়েন্সের সন্ধি: যাবজ্জীবন প্রথম কনসালপদে নেপোলিয়ন।

১৮০৪ সম্রাটপদে নেপোলিয়ন।

১৮০৫ তৃতীয় শক্তিজোট; ট্রাফালগার ও অষ্টারলিজের যুদ্ধ।

১৮০৬ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা; জেনা'র যুদ্ধ; বার্লিন ঘোষণা।

১৮০৭ টিলজিটের সন্ধি।

১৮০৮ পেনিনসুলার যুদ্ধ।

১৮১২ ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ; মস্কৌতে নেপোলিয়ন।

১৮১৪ লাইপজিগের যুদ্ধ; শক্তিজোটের ফ্রান্স আক্রমণ; চৌমণ্টের চুক্তি; নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ; প্রথম প্যারিসের সন্ধি; ভিয়েনা সম্মেলন।

১৮১৫ ওয়াটারলুর যুদ্ধ; নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ; সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসন; দ্বিতীয় প্যারিসের সন্ধি।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the causes and course of the American war of Independence.

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ ও ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Briefly narrate the condition of Europe on the eve of the French Revolution.

ফরাসী বিপ্লবের ঠিক পূর্বে ইউরোপের অবস্থা বর্ণনা কর।

3. What were the Causes of the French Revolution? Or, what was the condition of France on the eve of the French Revolution.

কি কি কারণে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল? অথবা, ফরাসী বিপ্লব সুরু হইবার পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থা কিরূপ ছিল?

4. Give an account of the teachings of the French philsophers and their importance.

ফরাসী দার্শনিক বৃন্দের শিক্ষা ও তাহার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

5. Sketch the career of Napoleon from 1795-1807.

১৭৯৫ হইতে ১৮০৭ খৃঃ নেপোলিয়নের জীবনী আলোচনা কর।

6. Briefly describe the internal reforms of Napoleon.

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সমূহের বিবরণ দাও।

7. Sketch the career of Napoleon from the Peace of Tilsit to the Battle of Waterloo (1807-1815).

টিলজিটের সন্ধি হইতে ওয়াটারলুর যুদ্ধ পর্যন্ত নেপোলিয়নের জীবনী আলোচনা কর (১৮০৭-১৮১৫)।

8. Make an estimate of Napoleon. What were the causes of his downfall?

নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর। তাহার পতনের কারণ কি কি?

9. What were the results of the French Revolution?

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল কি কি?

10. Write notes on :—Montesquie, Voltaire, Rousseau, National Assembly, Fall of Bastille, Mirabeau, National Convention, Reign of terror, The Directory, Treaty of Campo Formio, The Consulate, Peace of Amiens, Treaty of Tilsit, Continental System, Peninsular war, Battle of Waterloo.

টীকা লিখ :—মঁন্তেস্ক, ভল্টেয়ার, রুশো, ন্যাশনাল এসেম্বলী, ব্যাষ্টিলের পতন, মিরাবো, জাতীয় সম্মেলন, সন্ত্রাসের রাজত্ব, ডাইরেক্টরী, ক্যাম্পোফোর্মিও'র সন্ধি, কনসাল শাসন, আমিয়েন্সের সন্ধি, টিলজিটের সন্ধি, মহাদেশীয় ব্যবস্থা, পেনিনসুলার যুদ্ধ, ওয়াটারলুর যুদ্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপের পুনর্গঠন (১৮১৫-১৮৭৮)

ভিয়েনা সম্মেলন (১৮১৪-১৫) ঃ নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার পর ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইউরোপকে পুনর্গঠিত করিয়া নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ভিয়েনায় এক সম্মেলনে মিলিত হন। নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এলবাদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর প্রথম ভিয়েনা সম্মেলন আরম্ভ হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলে সম্মেলনের কার্য সাময়িক ব্যাহত হয়। কিন্তু ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর সম্মেলন পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রই নেপোলিয়নের নিকট বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ভিয়েনা সম্মেলনে ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ জড়িত ছিল। নেপোলিয়ন খুশীমত বিভিন্ন রাজ্যের সীমা পরিবর্তিত করিয়াছিলেন এবং নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইউরোপকে পুনর্গঠন করা সহজসাধ্য ছিল না। একমাত্র তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল। প্রতিনিধি সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে এবং গুরুত্বে ভিয়েনা সম্মেলন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে রাশিয়া (জার প্রথম আলেকজাণ্ডার) ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটদ্বয়, প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ডেনমার্ক এবং অন্যান্য রাজ্যের নৃপতিগণ, অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী মেটারনিখ ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্যাসেলরিগ এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধি ট্যালির্যাণ্ড যোগদান করিয়াছিলেন। এই আড়ম্বরপূর্ণ সম্মেলনের জন্য অষ্ট্রিয়া প্রায় একশত যাট লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছিল। অথচ অষ্ট্রিয়ার রাজকোষের অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল।

ভিয়েনা সম্মেলনের নীতি ও কার্যকলাপ ঃ ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের পুনর্গঠন করা। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনটি নীতির দ্বারা সম্মেলনের নায়কগণ পরিচালিত হইয়াছিলেন। (১) ভবিষ্যতে ইউরোপের শান্তিরক্ষা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি সাম্য (Balance of power) রক্ষা করা;

নীতি

(২) বিপ্লবের সময় উৎখাত রাজপরিবারগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা (Principle of Legitimacy); (৩) বিজয়ী রাষ্ট্রগুলিকে পুরস্কার প্রদান করা এবং পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তি প্রদান করা।

প্রথমেই বিভিন্ন রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং সীমা নির্ধারণ করা হইল। ফ্রান্সের রাজ্যসীমা বিপ্লবের পূর্বে যাহা ছিল, প্রায় তাহাই নির্ধারিত হইল। কিন্তু ভবিষ্যতে ফ্রান্স যাহাতে শক্তিশালী হইয়া পররাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে তাহার জন্য ফ্রান্সের চতুর্দিকে শক্তিশালী কয়েকটি রাজ্য গঠন করা হইল। এইজন্য পূর্বে অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত প্রদেশ বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া একটি রাজ্য গঠন করা হইল। ইহার ফলে ফ্রান্সের উত্তর সীমায় একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠিত হইল। জেনোয়া, সার্ডিনিয়া রাজ্যের সহিত যুক্ত করিয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় শক্তিশালী সার্ডিনিয়া রাজ্য গঠন করা হইল।

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সার্ডিনিয়া

নরওয়েকে ডেনমার্ক হইতে ছিন্ন করিয়া সুইডেনের সহিত যুক্ত করা হইল। সুইজারল্যাণ্ডের সহিত তিনটি নূতন ক্যাণ্টন যুক্ত হইল এবং সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইল। রাশিয়া লাভ করিল ফিনল্যাণ্ড ও বেসারাভিয়া এবং পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল। প্রাশিয়া পাইল সুইডিস পোমেরেনিয়া, স্যাক্সনির অর্ধেক এবং রাইন নদীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত অঞ্চল। ফলে জার্মানীতে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি পাইল। বেলজিয়াম অষ্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। এইজন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাকে ইটালীতে ভেনিস এবং লোম্বার্ডি প্রদান করা হইল। ইহা ব্যতীত অষ্ট্রিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্বতীরে ইলিরীয় প্রদেশগুলি এবং ব্যাভেরিয়ার নিকট হইতে টাইরল লাভ করিল।

সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া

জার্মানীকে পুনর্গঠিত করা হইল। উনচল্লিশটি রাজ্য লইয়া একটি 'ফেডারেশন' গঠন করা হইল এবং ইহার শাসনকার্য পরিচালনার ভার অষ্ট্রিয়ার সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের (Federal Diet) উপর ন্যস্ত করা হইল। কিন্তু এই ফেডারেশনের ভিত্তি ছিল খুব দুর্বল।

জার্মানীর পুনর্গঠন

ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া ভেনিস এবং লোম্বার্ডি এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল লাভ করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া রাজপরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট পার্মা, মোডেনা এবং টাসকেনীর রাজবংশগুলিকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। ফলে ইটালীতে পুনরায় অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পোপের রাজ্যগুলি পোপকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। নেপল্‌সের সিংহাসনে পুনরায় বুরবন বংশের রাজাকে বসান হইল। জেনোয়া প্রদান করিয়া সার্ডিনিয়াকে শক্তিশালী করা হইল। সুতরাং ইটালী একাধিক রাজ্যে বিভক্ত হইয়া রহিল।

ইটালী

চতুর ইংলণ্ড ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্য বিস্তারের দিকে নজর রাখিয়াছিল। ইংলণ্ড ইউরোপে মাত্র হেলিগোল্যাণ্ড, মাল্টা এবং আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু স্পেনের নিকট হইতে ত্রিনিদাদ, ফ্রান্সের নিকট হইতে মরিসাস এবং টোবাগো, হল্যাণ্ডের নিকট হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ এবং সিংহল লাভ করিবার ফলে ইংলণ্ড পৃথিবীর বৃহত্তম ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হইল।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন উপনিবেশ লাভ

বিপ্লবের ফলে উৎখাত রাজবংশগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Legitimacy) নীতির স্রষ্টা ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ট্যালিরেণ্ড। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে বিজয়ী শক্তিগুলির লোলুপ গ্রাস হইতে মুক্ত করা। এই নীতি অনুযায়ী ফ্রান্স, স্পেন এবং নেপল্‌স্‌এ বুরবন বংশ, সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টে স্যাভয় বংশ এবং হল্যাণ্ডে অরেঞ্জবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নীতি অনুযায়ী পোপের ধর্মরাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং নেপোলিয়ন কর্তৃক সৃষ্ট রাইন রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত জার্মান রাজ্যগুলির প্রাক্তন রাজবংশগুলি পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিল।

উৎখাত রাজবংশগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ভিয়েনা সম্মেলনের সমালোচনা ঃ ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ইহার নীতি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল।

রাষ্ট্রনায়কগণ বিপ্লবের ভয়াবহ স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বিপ্লবের বাণী এবং উদ্দেশ্য নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহারা বিপ্লবের পূর্বেকার যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং পুরাতন রাজা ও রাজবংশগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সীমান্তে একাধিক শক্তিশালী রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি
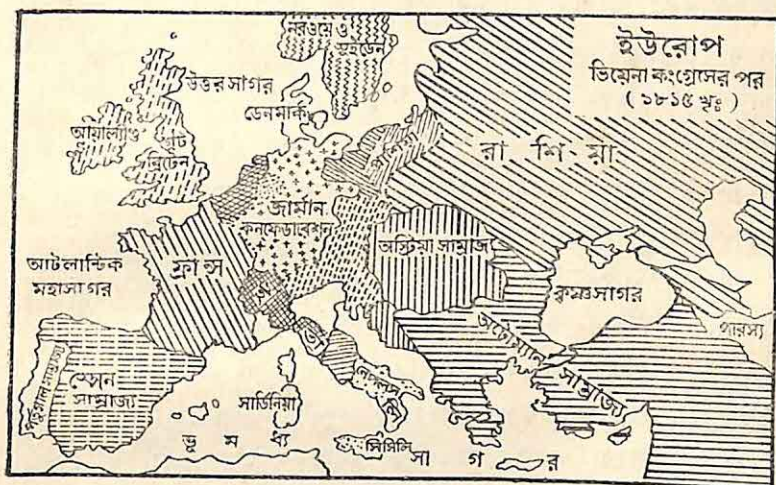
হয় নাই। কিন্তু ভেনিস এবং জেনোয়ার ক্ষেত্রে এই নীতি লংঘন করিয়া একটিকে অষ্ট্রিয়া এবং অপরটিকে সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। আসলে বিজয়ী শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং নির্লজভাবে বিজিত রাজ্যগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া। জনসাধারণের আশা ও আকাংখাকে তাহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভাগাভাগিতে মত্ত রাষ্ট্র কর্ণধারগণ কালের গতি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের কার্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী নায়কবর্গের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হইতেছে এই যে তাহারা ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। (The real charge that may be brought

against the monarchs of Vienna is that they ignored the challenge of the French Revolution"—Ketelbey)। ফরাসী বিপ্লবের বাণী সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িবার ফলে বিভিন্ন জাতি গণতন্ত্র এবং জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রনায়কগণ এই আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সম্মেলনের কার্যাবলী হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেল্টিক ভাষাভাষী এবং ক্যাথলিক অধ্যুষিত বেলজিয়ামকে, টিউটনিক ভাষাভাষী ও প্রোটেষ্টাণ্ট অধ্যুষিত হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। ডেনমার্কের সহিত দীর্ঘদিন ধরিয়া যুক্ত নরওয়েকে সুইডেনের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। জার্মানীর জনসাধারণের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পুরাতন রাজবংশগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এবং অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে এক দুর্বল ফেডারেশন গঠন করা হইয়াছিল। ইটালীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে প্রাক্তন রাজবংশগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়কগণ জনসাধারণের জাতীয় আশা এবং আকাংখাকে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভিয়েনায় সম্মিলিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের শক্তিশালী ভাবধারার গতি ও বিস্তৃতি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা তাহাদের দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয়। ১৮১৫ খৃঃ পর হইতে ইউরোপের ইতিহাস ভিয়েনা কংগ্রেসের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। বেলজিয়াম হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইয়া গেল। ভিয়েনা সম্মেলনের ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ও ইটালী জন্মলাভ করিল।

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা

ব্যর্থতা

ভিয়েনা কংগ্রেসের কার্যাবলী প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও ইহার মধ্যে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বীজ নিহিত ছিল। এই সম্মেলনেই রাশিয়াকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং পশ্চিম ইউরোপের ঘটনাবলীতে তাহার হস্তক্ষেপ স্বীকৃতিলাভ করিল। সুইডেনের শক্তি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গেল।

তাৎপর্য

জার্মানীতে নেপোলিয়নের বিভিন্ন ব্যবস্থা অনেকখানি বজায় রহিল। অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য অবলুপ্ত হওয়ায় জার্মানীর রাজ্যগুলির সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। রাইন অঞ্চল প্রাশিয়াকে অর্পণ করিবার ফলে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি হ্রাস পাইল এবং প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হইল। পরবর্তীকালে প্রাশিয়াই ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। জেনোয়াকে সার্ডিনিয়া-পিডমণ্ট রাজ্যের সহিত যুক্ত করিবার ফলে সার্ডিনিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং পরোক্ষভাবে সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ইটালী গঠনের আন্দোলনকে সাহায্য করা হইয়াছিল।

ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বীজ নিহিত

পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) : ভিয়েনা সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জয়জয়াকার হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কগণ শুধুমাত্র ইউরোপের পুনর্গঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কারণ বিপ্লবের ভীতি তাহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। ভিয়েনা সম্মেলনের ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য এবং ইউরোপের শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে 'পবিত্র মৈত্রী' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ছিলেন আদর্শবাদী এবং স্বপ্নবিলাসী। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন ফরাসী বিপ্লব ধর্মবিরোধী কার্য এবং ভবিষ্যতে বিপ্লব এড়াইতে হইলে ইউরোপের নৃপতিগণকে খৃষ্টধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিতে হইবে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ইহার নিকট তাহাদের দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জার তাহার এই আদর্শ একটি প্রচারপত্রে লিপিবদ্ধ করিলেন এবং তুরস্কের সুলতান ও পোপ ব্যতীত সকলকে এই দলিলে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু ইংলণ্ড এই মৈত্রী হইতে দূরে রহিল। জার আলেকজাণ্ডার আন্তরিকভাবে

জার আলেকজাণ্ডারের আদর্শ

রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় এবং সমষ্টিগত জীবনে খৃষ্টধর্মের আদর্শ প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জার ব্যতীত আর কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিতেন না। ক্যাসেলরিগ ইহাকে 'হেঁয়ালি এবং চরম নিবুর্দ্ধিতা' এবং মেটারনিখ 'অন্তঃসারশূন্য উচ্চ নিনাদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। 'পবিত্র মৈত্রী'র আদর্শ অনুযায়ী কোন সন্ধি স্থাপিত হয় নাই এবং বাস্তব-ক্ষেত্রে কখনও প্রয়োগ করা হয় নাই। 'পবিত্র মৈত্রী' ছিল জারের স্বপ্নবিলাসী এবং হেঁয়ালী মনের সৃষ্টি। অন্য কোন রাষ্ট্রনায়ক এই মৈত্রীর প্রায়াজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ফলে ১৮২৫ খৃঃ জারের মৃত্যুর পর পবিত্র মৈত্রী বিলুপ্ত হয়।

ব্যর্থ

কনসার্ট অব ইউরোপ ঃ পবিত্র মৈত্রী কোন সন্ধি নহে। স্বপ্নবিলাসী আলেকজাণ্ডারের আদর্শের লিখিত রূপ। সুতরাং ভিয়েনা সম্মেলনের পর একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই প্রয়োজনীয়তার জন্যই ১৮১৫ খৃঃ (নভেম্বর) প্রাশিয়া, রাশিয়া; অষ্ট্রিয়া এবং গ্রেটবৃটেনকে লইয়া এক চতুঃশক্তি মৈত্রী (Quadruple Alliance) স্থাপিত হইল। স্থির হইল এই মৈত্রীতে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি সময় সময় বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হইয়া বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিবে। ইহার উদ্দেশ্য হইল ফ্রান্সের সহিত সন্ধির সর্ত বজায় রাখা, ইউরোপের শান্তি রক্ষা করা এবং চারিটি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। এই চতুঃশক্তি মৈত্রীর বিভিন্ন অধিবেশন কনসার্ট অব ইউরোপ নামে অভিহিত হইয়াছে।

চতুঃশক্তি মৈত্রী

চতুঃশক্তি লইয়া গঠিত কনসার্টের প্রথম অধিবেশন আয়েক্স-লা স্যাপেলে অনুষ্ঠিত হয় (১৮১৮)। ফ্রান্সের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ফ্রান্স হইতে মিত্ররাষ্ট্রগুলির সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইল এবং পঞ্চম শক্তি হিসাবে ফ্রান্সকে কনসার্টের সদস্যপদ প্রদান করা হইল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর কনসার্ট উদ্ধত নির্দেশ প্রদান করিতে লাগিল। ইহাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অসন্তুষ্ট হইল এবং সুইডেনর রাজা বার্ণাদোত কনসার্টের নিকট বৃহৎশক্তিগোষ্ঠীর কার্যাবলীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

আয়েক্স লা স্যাপেলের সম্মেলন

নিজেদের স্বার্থ লইয়া চতুঃশক্তির মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমন এবং ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুদের কার্যকলাপ দমন করিবার প্রশ্ন লইয়া ইংলণ্ডের সহিত অন্য রাষ্ট্রগুলির বিরোধ সৃষ্টি হইল। ১৮২০ খৃঃ নেপলস্, স্পেন এবং পর্তুগালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কনসার্টের অন্তর্ভুক্ত বৃহৎশক্তিগুলি এই বিদ্রোহের নিন্দা করিল। কিন্তু দমন করিবার প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিল। ঐ বৎসরই ট্রপো (Troppau) নগরে কনসার্টের এক অধিবেশন আহ্বান করা হইল। এই অধিবেশনে বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার নীতি ঘোষণা করা হইল (Troppau Protocal)। কিন্তু ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এই নীতির তীব্র নিন্দা করে। পরবৎসর (১৮২১) লাইবেক অধিবেশনে অষ্ট্রিয়াকে নেপল্সের বিদ্রোহ দমন করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অতঃপর অষ্ট্রিয়া নেপল্স ও পিডমণ্টের বিদ্রোহ দমন করিল। ১৮২২ খৃঃ তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকদের বিদ্রোহ এবং স্পেনের বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে ভেরোনা নগরে কনসার্টের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। রাশিয়া গ্রীক বিদ্রোহ এককভাবে দমন করিবার দাবী করিল। কিন্তু ইহাতে রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার আশংকায় মেটারনিখ এই দাবীর তীব্র বিরোধিতা করিলেন। ইংলণ্ড মেটারনিখকে সমর্থন জানাইল, ফলে রাশিয়ার দাবী অগ্রাহ্য হইল। স্পেনের প্রশ্নে বৃহৎশক্তিগুলির মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল। স্পেনের রাজা ফরাসী সম্রাটের নিকট বিদ্রোহ দমনের জন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করিতে ইংলণ্ড বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ফ্রান্স যখন স্পেনে হস্তক্ষেপ করিবার অনুমতি পাইল, তখন ক্রুদ্ধ ইংলণ্ড কনসার্ট পরিত্যাগ করিল। ফরাসী সাহায্যে স্পেনরাজ বিদ্রোহ দমন করিলেন।

ট্রপো সম্মেলন

লাইবেক সম্মেলন

ভেরোনা সম্মেলন

স্পেনে ফরাসী আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় ইংলণ্ড ক্ষুদ্ধ হইয়াছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যানিং দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। কারণ ফ্রান্সের সাহায্যে স্পেন কর্তৃক

এই বিদ্রোহ দমনে বাধা প্রদান করিতে ইংলণ্ড বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মন্‌রো ইংলণ্ডের নীতি সমর্থন করিলেন। মন্‌রো ভবিষ্যতে আমেরিকার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং উপনিবেশ বিস্তারের বিরুদ্ধে ইউরোপের শক্তিবর্গকে সতর্ক করিয়া দিলেন। এই বিরোধিতার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইল না। সুতরাং কনসার্ট ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ্যতঃ তিনটি কারণে কনসার্টের ভাঙ্গন হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইংলণ্ড কর্তৃক কনসার্ট পরিত্যাগ; দ্বিতীয়তঃ শক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং তৃতীয়তঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত।

মন্‌রো নীতি

কনসার্টের ভাঙ্গন

মেটারনিখ ঃ মেটারনিখ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগের ইউরোপের ইতিহাস একটিমাত্র ব্যক্তির কূটনৈতিক প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছিল—তিনি হইলেন মেটারনিখ। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ পর্যন্ত সময়কালকে মেটারনিখের যুগ বলা হয়। অসাধারণ কূটনৈতিক প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ কর্ম-প্রতিভার বলে তিনি প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবত ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার এবং নিজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ তিনি অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারই প্রচেষ্টায় বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিয়েনা সম্মেলনের মধ্যমণি ছিলেন মেটারনিখ। সম্মেলনে তাহার প্রাধান্য ছিল অনস্বীকার্য। তিনি ইউরোপে শান্তি এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষপাতি ছিলেন। স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান শত্রু। তিনি সমগ্র ইউরোপে পুলিশী রাজত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কঠোর হস্তে সমস্ত

মেটারনিখ

বিদ্রোহ এবং গণআন্দোলন দমন করিয়াছিলেন। চার্লসবাড (Charlsbad Decree) ঘোষণার দ্বারা তিনি জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তব্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। জার্মাণীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত রাখিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বজায় রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। এইজন্য জার্মাণীতে জনসভা নিষিদ্ধ করেন, সংবাদপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করেন। ইটালীর সমস্ত জাতীয় আন্দোলন দমন করিয়া ইটালীকে অষ্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল রথচক্রে বাঁধিয়া রাখেন। ট্রপো, ভেরোনা ও লাইবেক সম্মেলনে মেটানিখের নীতির জয় জয়কার হয়। তিনি নেপলস্ এবং পিডমণ্টের বিদ্রোহ চূর্ণ করেন। গ্রীকদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন।

মেটারনিখ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ। সকল প্রকার বিদ্রোহ এবং জাতীয় আন্দোলন দমনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। চার্লসবাড ঘোষণা এবং ট্রপো ঘোষণা তাহার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রমাণ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মেটারনিখ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী এবং অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাহার নীতি ও উদ্দেশ্য। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীদের লইয়া গঠিত ছিল। সুতরাং নির্মমভাবে ইউরোপের বিদ্রোহ এবং জাতীয় আন্দোলনগুলি দমন না করিলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িত। ফরাসী বিপ্লবের সুরু হইতে ইউরোপে যে অশান্তি এবং রক্তপাত সুরু হইয়াছিল মেটারনিখের কৃতিত্বের ফলে তাহার অবসান হইয়া ইউরোপে সাময়িক শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষা এবং ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা, ইহাই ছিল মেটারনিখের নীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু মেটারনিখ ছিলেন সুবিধাবাদী ও ধূর্ত্ত। তিনি ছিলেন সফল কূটনীতিবিদ কিন্তু রাষ্ট্রনীতিবিদ নহেন। ধ্বংস কার্যেই তিনি প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, গঠনমূলক কার্যে কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহার নীতি ছিল স্থিতিশীল, গতিশীল নহে। মেটারনিখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার নীতির কোন ভবিষ্যৎ নাই। তিনি বলিতেন "পৃথিবীতে হয় আমি খুব আগে আসিয়াছি অথবা খুব বিলম্বে আসিয়াছি"। (I have come into this world

either too early or too late)। তিনি যুগের ধারা ও ইতিহাসের গতি অনুভব করিতে পারেন নাই। বিপ্লব ধ্বংস করিয়াছেন কিন্তু আদর্শ ধ্বংস করিতে পারেন নাই। ("For a tired and timid generation he was a necessary man ; and it was his misfortune that he survived his usefulness and he failed to recognise that, while he was growing old and feeble, the world was renewing its youth")।

ফ্রান্স ১৮১৫—১৮৪৮ খৃঃ

অষ্টাদশ লুই ঃ ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার পর বিজয়ী শক্তিগুলি অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাইয়াছিল। তাহার রাজত্বকালে দুইটি দলের অভ্যুদয় হইয়াছিল একটি দলে ছিল প্রজাতন্ত্রী এবং বোনাপার্টবংশের অনুগামীগণ। আর একটি দলে ছিল উগ্র রাজতন্ত্রীগণ। সম্রাট অষ্টাদশ লুই ছিলেন দুর্বল এবং ভীতু। সুতরাং তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন। প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিণতি এবং বিপ্লবের নির্মমতা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি শাসন কার্যে উদার নীতি অনুসরণ করেন। উদারপন্থী রাজতন্ত্রীদের সহতায় তিনি ফ্রান্সের পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করেন। ১৮২৪ খৃঃ তাহার মৃত্যু হয়।

দশম চার্লস ঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বে তিনি এমিগারদের নেতা ছিলেন। তাহার রাজত্ব কালে ধর্মযাজক এবং অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ধর্ম যাজকদের অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় এবং অভিজাতদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে চার্লস কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। আলজিয়ার্স অধিকৃত হয় এবং গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য প্রদান করা হয়। কিন্তু সম্রাট যখন পলিগন্যাক নামক এক প্রতিক্রিয়াশীল এবং উগ্রপন্থী ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন তখন পুনরায় ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। পলিগন্যাক সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন এবং প্রতিনিধি

সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। জনসাধারণ বুঝিল সম্রাট স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন।

জুলাই বিপ্লব (জুলাই ১৮৩০) : বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্যারিসের জনতা সম্রাটের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। চারিদিন ধরিয়া জনতা প্যারিসের রাস্তায় আরোধ সৃষ্টি করিয়া যানবাহন অচল করিয়া দিল। সৈন্যবাহিনীর সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ হইল। সৈন্যবাহিনীর একাংশ সম্রাটকে পরিত্যাগ করিল—আর এক অংশ যুদ্ধ না করিয়া নিশ্চল রহিল। শেষ মুহূর্তে সম্রাটের আপোষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। চার্লস ভীত হইয়া ক্রন্দনরত অবস্থায় ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। ফ্রান্সে বুরবণ বংশের শাসনের অবসান হইল। জনতা অর্লিয়েনিষ্ট বংশীয় লুই ফিলিপিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাইল। তিনি শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিবার শপথ গ্রহণ করিলেন।

জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া : জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বেলজিয়ামের অধিবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। বেলজিয়াম হল্যাণ্ড হইতে পৃথক হইয়া স্বাধীন হইয়া গেল। ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কগণ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। ভিয়েনা ব্যবস্থার উপর ইহাই প্রথম আঘাত। জুলাই বিপ্লব ও বেলজিয়ামের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া পোলগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া তিনবার পোল্যাণ্ড নিজেদের উদরস্থ করিলেও ভিয়েনা সম্মেলনের সময় পুনরায় রাশিয়ার নেতৃত্বে পোল্যাণ্ড গঠন করা হয়। কিন্তু জারের আধিপত্য মুক্ত হইবার জন্য পোলগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। জার প্রথম নিকোলাস নির্মম হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। বিপ্লবের ঢেউ জার্মাণীতেও পৌছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসীগণ শাসকদের উদার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে বাধ্য করিল। ইহাতে ভীত হইয়া মেটারনিখ পুনরায় জার্মাণীর উপর প্রতিক্রিয়ার রথচক্র চালনা করিলেন। ইটালীতেও

পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিল, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে এই সকল বিদ্রোহ দমন করা হয়।

সুতরাং পোল্যাণ্ড, জার্মাণী এবং ইটালীর বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের ফলে বেলজিয়াম স্বাধীনতা অর্জন করিল। ফ্রান্সে পুনরায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। লুই ফিলিপিকে সিংহাসনে বসাইবার ফলে বুবরণ বংশের অবসান হইল এবং অর্লিয়েনিষ্ট রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

লুই ফিলিপি ১৮৩০-৪৮ : লুই ফিলিপি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার বয়স সাতান্ন বৎসর। তিনি ছিলেন অর্লিয়েনিষ্ট বংশের সন্তান। লুই প্রথম জীবনে ছিলেন জেকোবিন ক্লাবের সদস্য। স্বদেশের স্বাধীনতা এবং বিপ্লব রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভ্লামি এবং জেমাপ্পির যুদ্ধে যোগদান করেন। অতঃপর প্রাণ ভয়ে ফ্রান্স হইতে পলায়ন করেন এবং একুশ বৎসর বিদেশে অতিবাহিত করেন। সিংহাসনে আরোহনের সময় তিনি 'ফ্রান্সের রাজা' উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'ফরাসীদের রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। লুই সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। প্যারিসের রাজপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করিতেন। নিজ পুত্রদের শিক্ষালাভের জন্য তিনি তাহাদের সাধারণ স্কুলে প্রেরণ করেন।

প্রথম জীবন

কিন্তু একদা বিপ্লবের সমর্থক লুই ফিলিপির পশ্চাতে কোন দলের সমর্থন ছিল না। আঠারো বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা কোন পক্ষের সমর্থনে নহে—তাহার বিরোধী দলগুলির অনৈক্যের ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। বুরবন বংশের সমর্থকগণ তাহাকে ঘৃণা করিত—তাহারা বুরবন বংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় উৎসুক ছিল। প্রজাতন্ত্রীরা কখনই রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সুনজরে দেখে নাই। বোনাপার্টের অনুগামীরা লুইয়ের পররাষ্ট্রনীতি দুর্বল বলিয়া মনে করিত এবং বোনাপার্ট বংশের একজনকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্সের জনসাধারণ কেহই লুই ফিলিপিকে চাহে নাই। তাহার রাজত্বকালে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল

লুইফিলিপির প্রতি সমর্থনের অভাব

এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হইয়াছিল। তথাপি লুইয়ের রাজত্বকালে রাজ্যব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং বিদ্রোহ প্রায় লাগিয়াই ছিল। ১৮৩২ খৃঃ বুরবন বংশের সমর্থকদের প্রভেন্স এবং লা ভেণ্ডীতে বিদ্রোহ, ১৮৩৪ খৃঃ লায়ন্স'এ প্রজাতন্ত্রীদের বিদ্রোহ, ১৮৩৫ খৃঃ সম্রাটকে হত্যার ষড়যন্ত্র, ১৮৩৫ এবং ১৮৪০ খৃঃ লুই নেপোলিয়নের উস্কানিতে বিদ্রোহ লুই ফিলিপির রাজত্বকাল সংকটময় করিয়া তুলিয়াছিল।

বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র

তথাপি একাধিক বিপদ সত্বেও লুইয়ের রাজত্বকালে ফ্রান্সের প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি হইয়াছিল। বিভিন্ন দলের বিরোধিতার মধ্যেও লুই শান্তিবাদী নিয়মতান্ত্রিক দলের সমর্থন পাইয়াছিলেন। এই দলে অধিকাংশই ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সুতরাং জুলাই রাজতন্ত্র (লুই ফিলিপির রাজতন্ত্র) ছিল মধ্যবিত্ত সমর্থিত রাজতন্ত্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হইত। এই সময় আলজিরিয়া বিজয় সমাপ্ত হয় এবং আফ্রিকার গিনি এবং মাদাগাস্কারে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ফ্রান্সে শিল্প এবং সাহিত্যেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়।

ফ্রান্সের উন্নতি

লুইয়ের মন্ত্রী ছিলেন গিজো। তিনি যে কোন প্রকার সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। অপর পক্ষে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন থিয়ের্স—তিনি বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন এবং জনসাধারনের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবী জানাইলেন। এই সময় একটি নূতন শ্রেণীর আবির্ভাব হয় যাহার ফলে লুইয়ের শাসনব্যবস্থা নূতন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ফ্রান্সে শিল্পোন্নয়নের ফলে বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। ইহাদের মজুরী ছিল সামান্য—ফলে দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। ইহাদের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের মধ্য হইতে সমাজতন্ত্রের জন্ম হইল। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য বিখ্যাত মনীষী লুই ব্ল্যাংক 'শ্রমিক সংগঠন' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। তিনি ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের বিরোধিতা করিলেন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প এবং কলকারখানা নিয়ন্ত্রনের দাবী জানাইলেন। কিন্তু গিজোর

লুই ব্ল্যাংক ;
সমাজতন্ত্রের জন্ম

পরামর্শে লুই এই দাবীর প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য একাধিক গুপ্ত সমিতি গঠন করিল। সমাজতন্ত্রের আদর্শে সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় লুই ফিলিপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

লুইয়ের পররাষ্ট্রনীতি ছিল দুর্বল ও শান্তিপূর্ণ। ইটালী পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাহার নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। জনসাধারণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহারা সম্রাটকে ভীরু, কাপুরুষ, অপদার্থ বলিয়া কঠোর নিন্দা করিল। লুই ফিলিপির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ১৮৪৮ : লুইয়ের শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভাবিত এবং তাহাদের স্বার্থে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা শ্রমিক, চাষী এবং ধনিক শ্রেণীকে অসন্তুষ্ট এবং বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল। তরুণ ফরাসীগণ লুইয়ের পররাষ্ট্র নীতি দুর্বল এইং নিষ্প্রাণ মনে করিত। নেপোলিয়নের গৌরবময় দিনগুলির স্মৃতি তাহাদিগকে লুইয়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সকল প্রকার পরিবর্তন ও সংস্কার বিরোধী শাসন ব্যবস্থার অবসানের জন্য প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা সচেষ্ট হইতেছিল। ফ্রান্স যখন এইভাবে আর একটি বিপ্লবের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তখন একটি ঘটনা এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিল। রাষ্ট্রসভায় থিয়ের্স ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবী জানাইলেন। কিন্তু মন্ত্রী গিজো যে শুধু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন তাহাই নহে তিনি এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আন্দোলনকারীদের দমন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ এইবার ভাঙ্গিয়া গেল। প্যারিসের জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "গিজো নিপাত হোক" (ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮)। অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া লুই গিজোকে পদচ্যুত করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছিল, ফলে প্রকাশ্য দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল। "প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হউক" এই ধ্বনিতে প্যারিস মুখরিত হইয়া উঠিল। সশস্ত্র জনতা তুলারীজ প্রাসাদ আক্রমণ করিল। ভীত লুই পৌত্রের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। কিন্তু জনতা

রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিল। ল্যামার্টেনের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হইল। রাজপ্রাসাদে প্রজাতন্ত্রীদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হইল। একই সময়ে হোটেল ডি ভিলাতে সমাজতন্ত্রীরা রক্তপতাকা উত্তোলন করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রীদের জয় হইল।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া : জুলাই বিপ্লবের ন্যায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র ইউরোপে দেখা দিয়াছিল। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে বিপ্লবের দাবাগ্নি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। দুর্বল ঐক্যসূত্রে গ্রথিত অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব দেখা দিল। মেটারনিখের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থায় অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি জর্জরিত হইতেছিল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সংবাদ যখন ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল তখনই ঘূণধরা শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। ইতিপূর্বে হাঙ্গেরীতে গণআন্দোলন সুরু হইয়াছিল। তাহার ঢেউ ভিয়েনায় আসিয়া আঘাত করিল। মেটারনিখ বুঝিলেন ধ্বংস আসন্ন-ইউরোপকে বিস্মিত করিয়া তিনি ইংলণ্ডে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম ফ্রান্সিস জোসেফের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন (১৮৪৮)। অতঃপর সমগ্র ইটালী ব্যাপী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মিলান ও ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী বিতাড়িত হইল। বোহেমিয়া এবং ভিয়েনাও ইটালীর পথ অনুসরণ করিল। চেকজাতি প্রাগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, আর একদিকে হাঙ্গেরীতে ম্যাগিয়ার জাতি তরুন নেতা কসুথের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিল। সম্রাট হাঙ্গেরীর স্বায়ত্বশাসনের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ

তথাপি বিপ্লবের জয় হইল না। কারণ অষ্ট্রিয়ার অধীন জাতিগুলির মধ্যে ছিল দারুণ রেষারেষি। অনতিবিলম্বে ম্যাগিয়ার ও সার্ভদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফলে হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়িল। অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার সাহায্যে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ চূর্ণ করিল। বোহেমিয়া, ইটালী এবং ভিয়েনার বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন

অষ্ট্রিয় সৈন্যবাহিনী সহজেই দমন করিল। ১৮৪৮ এর জাতীয় অভ্যুত্থানগুলি ব্যর্থ হইল, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হইল না। বরং পরাধীন জাতিগুলি বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। হাঙ্গেরীর বিপ্লবী নেতা কসুথ তুরস্কে পলায়ন করিলেন।

ইটালীর ঐক্য আন্দোলন

ইটালী ১৮১৫-১৮৫০ খৃঃ ঃ ১৮১৫ খৃঃ ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইটালীর দুইটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। জেনোয়া রাজ্য পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। নেপলস এবং সিসিলীতে বুরবণ রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পোপের রাজ্য পোপের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। পার্মা, মোডেনা এবং টাসকেনীতে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের শাসন পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ইটালীর জনসাধারণের আশা আকাংখাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া পুরানো ব্যবস্থাকেই চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভিয়েনা বন্দোবস্ত

সুতরাং ভিয়েনা সম্মেলনে পুনর্গঠিত ইটালীর কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না—ছিল ভৌগলিক পরিচয় মাত্র। কারণ সমগ্র ইটালী একাধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্য ছিল না। প্রতিটি রাজ্য নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিত। জাতীয় আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বাধা ছিল প্রতিটি রাজ্যের প্রাদেশিক ও স্বার্থপর মনোভাব। ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন রকমের। এই অনৈক্য এবং বৈচিত্র্যের দেশ ইটালীর উপর ছিল অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য। ভেনিস এবং লোম্বার্ডি ছিল অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত। পার্মা, মোডেনা এবং টাসকেনীর সিংহাসনে ছিল অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়বর্গ। এই রাজ্যগুলি ছিল অষ্ট্রিয়ার তাঁবেদার।

ঐক্যের প্রতিবন্ধক

ভিয়েনা সম্মেলন ইটালীতে পুরানো ব্যবস্থাই পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের বাণী ইটালীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নেপোলিয়নের

ইটালী বিজয়ের ফলে পুরানো ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত হইয়াছিল। ফরাসী সৈন্য-বাহিনীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা সাময়িকভাবে অনৈক্য বিস্মৃত হইয়াছিল এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল।

জাতীয় ঐক্যবোধের সঞ্চার

সুতরাং ভিয়েনার বন্দোবস্ত ইটালীয়দের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। প্রতিটি রাজ্যে জাতীয় আন্দোলন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হইবার ফলে ইটালীর সর্বত্র 'কার্বোনারি' নামে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল। জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ইটালীর তরুনেরা দলে দলে এই সমিতিতে যোগদান করিল। উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক আধিপত্য মুক্ত হওয়া এবং উন্নত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ১৮২০ খৃঃ নেপলস্এ 'কার্বোনারি'র নেতৃত্বে বিদ্রোহ হইল, কিন্তু অষ্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজা ফার্ডিনাণ্ডকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইল। পরবৎসর পিডমণ্টের বিদ্রোহ দমন করা হইল এবং লোম্বার্ডির আন্দোলন অষ্ট্রিয়ার সৈন্য বাহিনী স্তব্ধ করিয়া দিল। ইহার পর দশ বৎসর ধরিয়া ইটালী স্বৈরশাসনে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

কার্বোনারি

১৮৩০ খৃঃ ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের বার্তা যখন ইটালীতে পৌছিল তখন পুনরায় ইটালীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ সুরু হইল। পোপের রাজ্য, পার্মা এবং মোডেনায় বিপ্লবের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জলিতে লাগিল। কিন্তু পুনরায় অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত করিল।

জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

ক্রমাগত বিপর্যয়ে ইটালীয়গণ হতাশ হইল না বরং দ্বিগুন উৎসাহে তাহারা পুনরায় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রমানিত হইল 'কার্বোনারি'র বিপ্লব পদ্ধতি ইটালীর মুক্তিসাধন করিতে পারিবে না। আরও উন্নত এবং শক্তিশালী কার্যক্রম এবং আদর্শের প্রয়োজন। ইটালীর তরুন সমাজ যখন এই আদর্শের সন্ধানে দিশাহারা তখন ইটালীর ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হইলেন উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবগুরু ম্যাটসিনি। ম্যাটসিনির জন্ম হয় ১৮০৫ খৃঃ। বাল্যকাল হইতে তিনি স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ইটালীর স্বপ্ন

দেখিতেন। তরুন বয়সে তিনি 'কার্বোনারি'তে যোগদান করেন। ১৮৩০ খৃঃ তিনি পিডমণ্টে গ্রেপ্তার হন। তাহাকে নির্বাসিত করা হয়। কার্বোনারি আন্দোলনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া তিনি 'তরুন ইটালী' নামে এক নূতন দল গঠন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল ইটালীয়গণকে প্রজাতন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ম্যাটসিনির আবেদন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুন সমাজের অন্তর স্পর্শ করিল। সহস্র সহস্র তরুন ম্যাটসিনির পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হইল। ম্যাটসিনির প্রচেষ্টায় ইটালীর বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সকল বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু ম্যাটসিনির নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হইল।

ম্যাটসিনি

ম্যাটসিনির নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইটালীর জনসাধারণকে তিনি যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাই সমগ্র ইটালী ব্যাপী শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির সংহত করিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করাই ম্যাটসিনির বিরাট সাফল্যের পরিচয়। ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের তিনি পুরোহিত, জাতীয় আন্দোলনের জনক।

১৮৪৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে যখন ফ্রান্সে লুই ফিলিপির পতন হইল তখন তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইটালীর সর্বত্র পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সিসিলি, নেপলস্ টাসকেনী, পোপের রাজ্য এবং বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দেখা দিল। ভিয়েনায় বিদ্রোহের ফলে মেটারনিখ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। মেটানিখের পতনে উৎসাহিত হইয়া মিলান বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সমস্ত ইটালী হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ লোম্বার্ডিতে সমবেত হইল। সমগ্র ইটালীতে জাতীয়তাবাদের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। তরুন সাংবাদিক কাভুরের প্রাণস্পর্শী আবেদন এবং জনসাধারণের প্রবল দাবীর ফলে পিডমণ্টের রাজা চার্লস আলবার্ট জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কাসটোজার যুদ্ধে আলবার্ট

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া, ১৮৪৮

অষ্ট্রিয়ার হস্তে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে হতাশ না হইয়া ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে বিদ্রোহীগণ রোম ও টাসকেনীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। রাজা আলবার্ট পুনরায় অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নোভারার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার নিকট পরাজিত হইলেন। ভগ্নহৃদয়ে আলবার্ট পদত্যাগ করিয়া পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে সিংহাসন অর্পণ করিলেন। এদিকে ফ্রান্সের নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি লুই নেপোলিয়ন পোপের সাহায্যার্থে সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। রোম প্রজাতন্ত্রের পতন হইল। ইটালীর ঐক্য আন্দোলন আর একবার ব্যর্থ হইল।

ঐক্য আন্দোলন ব্যর্থ

ইটালীর ঐক্য সাধন (১৮৫০-৭০)

ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুর ঃ ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুর। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইহারা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে ম্যাটসিনি ছিলেন পুরোহিত, গ্যারিবল্ডী ছিলেন শক্তি, কাভুর ছিলেন কূট-নীতিবিদ। ম্যাটসিনি ইটালীয়গণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার আদর্শে ও প্রচারে অনুপ্রাণিত ইটালীয়গণ মাতৃভূমির ঐক্য সাধনের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু গ্যারিবল্ডী ছিলেন বাস্তববাদী বীর-পুরুষ। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অস্ত্রের জোরে ইটালীর ঐক্য সাধন সম্ভব হইবে। কোন প্রকার আপোষ বা আলোচনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। আদর্শের

ম্যাটসিনি

দিক হইতে তিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রাম সফল করিবার জন্য তিনি নিজের আদর্শ ত্যাগ করিয়া সার্ডিনিয়ার রাজার

নেতৃত্বে যুদ্ধ করিতে দ্বিধা করেন নাই। আদর্শ অপেক্ষা মাতৃভূমিকে তিনি অধিক ভালবাসিতেন। গ্যারিবল্ডী ব্যতীত ইটালীর ঐক্য আন্দোলন সফল হইত না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ইটালীর রূপদান করিয়াছিলেন কাভুর। তিনি ছিলেন সফল কূটনীতিবিদ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজ নীতিবিদ।

গ্যারিবল্ডী

ম্যাটসিনির আদর্শ ও প্রচেষ্টা এবং গ্যারিবল্ডীর সাহস ও শক্তিকে নিজের কূটনৈতিক প্রতিভার সহিত সমন্বয় করিয়া ইটালীর ঐক্য আন্দোলন সফল করিয়াছিলেন। (His was the master brain which mobilised the inspiration of Mazzini into a diplomatic force and beat the sword of Garibaldi into a national weapon—Ketelbey)। এই ত্রয়ীর সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন সার্ডিনিয়া পিডমণ্টের স্বদেশ প্রেমিক রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল। তাহার ত্যাগ, বিচারবুদ্ধি এবং সামরিক প্রতিভা ঐক্য আন্দোলন শক্তিশালী করিয়াছিল।

কাভুর

কাভুরের নীতিঃ কাভুরের জন্ম হয় ১৮১০ খৃঃ পিডমণ্টে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার। অতঃপর তিনি ইংলণ্ড ভ্রমণের পর জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি রিসর্জিমেণ্টো নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং পীডমণ্টে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের দাবী করেন। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তিনি পিডমণ্টের রাজার প্রতি আকুল আবেদন জানান। ১৮৫০ খৃঃ তিনি পিডমণ্টের মন্ত্রী এবং ১৮৫২ খৃঃ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৮৪৮-৪৯ খৃঃ

বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার ফলে প্রজাতন্ত্রীদের শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৮৪৮-৪৯ খৃঃ সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের রাজা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইটালীয়গণ সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের রাজার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ইটালী গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিল। কাভুরের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্র উচ্ছেদ না করিয়া সার্ডিনিয়ার রাজার নেতৃত্বে ইটালী রাজ্য গঠন করা। কিন্তু তিনি অনুভব করিয়াছিলেন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া ঐক্যসাধন সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ ইটালীর সমস্যা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিতে হইবে।

নীতি

প্রথমে তিনি সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিলেন এবং সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া শক্তিশালী করিলেন। অতঃপর ইংলণ্ড ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশের সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি ইটালীর সমস্যার প্রতি ইউরোপের জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রনায়কগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অবিরাম প্রচার করিয়া যাইতে লাইলেন। এই সময় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬) আরম্ভ হয়। সার্ডিনিয়ার এই যুদ্ধে যোগদানের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্য লাভের আশায় কাভুর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিলেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে পনেরো হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও কাভুর প্যারিস সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইলেন (১৮৫৬)। এই সম্মেলনে তিনি ইটালীর সমস্যা উত্থাপন করেন এবং অষ্ট্রিয়ার নির্মম শাসনের স্বরূপ উদঘাটিত করেন। ইটালীর সমস্যা ইউরোপের সমস্যায় পরিণত হইল। কাভুর ইটালীর জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইলেন। এই সময় অরসিনি নামক একজন ইটালীয়, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে হত্যার চেষ্টা করে। সার্ডিনিয়া-ফ্রান্সের মৈত্রী হয়ত বিনষ্ট হইত, কিন্তু কাভুর সম্রাটকে লিখিলেন, অষ্ট্রিয়ার নির্মম

সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের উন্নতি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান

শাসনের ফলে ইটালীয়গণের মধ্যে যে হতাশা এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এই হত্যা প্রচেষ্টা তাহারই প্রতিক্রিয়া। অরসিনিও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সম্রাটের প্রতি করুন আবেদন করিলেন 'ইটালীকে মুক্ত করুন'। এই আবেদন তৃতীয় নেপোলিয়নের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগদানে সম্মত হইলেন।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থন

অস্ট্রিয়া-সার্ডিনিয়া যুদ্ধ ১৮৫৯ : অতঃপর কাভুর অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কাভুর চাহিয়াছিলেন অষ্ট্রিয়াই প্রথম আক্রমণ করুক। কারণ তাহা হইলে অষ্ট্রিয়া সর্বত্র আক্রমণকারী বলিয়া নিন্দিত হইবে। ভিক্টর ইমানুয়েল এবং কাভুর ক্রমাগত অষ্ট্রিয়া বিরোধী বক্তৃতা এবং কার্যকলাপে লিপ্ত হইলেন। ইংলণ্ড শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব করিল। কিন্তু হঠাৎ অষ্ট্রিয়া এক চরম পত্র প্রেরণ করিয়া সার্ডিনিয়ার সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী করিল—অন্যথায় যুদ্ধ। কাভুর ইহারই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৮৫৯)। ফ্রান্স-সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সহিত সমগ্র ইটালী হইতে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যোগদান করিল। ম্যাগেণ্টা এবং সলফারিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। লোম্বার্ডি হইতে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত হইল। ভেনিস হইতে অষ্ট্রিয় বাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য সম্মিলিত বাহিনী প্রস্তুত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন সার্ডিনিয়ার সহিত পরামর্শ না করিয়াই ভিলাফ্রাংকায় অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন (১৮৫৯)। লোম্বার্ডি, সার্ডিনিয়াকে প্রদান করা হইল। টাসকেনী মোডেনা এবং পার্মার জনসাধারণ কর্তৃক বিতাড়িত শাসকগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হইল; পোপের সভাপতিত্বে ইটালীর রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব করা হইল। সার্ডিনিয়ার সহিত পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী নেপোলিয়ন নীস এবং স্যাভয়ের জন্য দাবী পেশ করিলেন না। জুরিখের চুক্তি দ্বারা এই সর্তগুলি পুনরায় অনুমোদন

ভিলাফ্রাংকার সন্ধি

সার্ডিনিয়ার লোম্বার্ডি লাভ

করা হইল। কতকগুলি কারণে নেপোলিয়ন অকস্মাৎ অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সলফারিনোর যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল এবং ভেনিসে শক্তিশালী অষ্ট্রিয় বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রাশিয়া উত্তর দিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ ফ্রান্সে শক্তিশালী ক্যাথলিক দল এই যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছিল। চতুর্থতঃ অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে উত্তর ও মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলিতে যে গণ অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাহাতে নেপোলিয়ন ভীত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ইটালীর স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ইটালী চাহেন নাই।

ঐক্য আন্দোলনের অগ্রগতি ঃ কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ভিক্টর ইমান্থুয়েলকে এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজা অবস্থা বিবেচনা করিয়া সন্ধি মানিয়া লইলেন। ইহার প্রতিবাদে কাভুর পদত্যাগ করিলেন। অবশ্য অল্পকাল পরেই তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ইটালির টাসকেনী, পার্মা এবং মোডেনায় গণঅভ্যুত্থানের ফলে শাসকগণ বিতাড়িত হইল। পোপের অধীন রোমাগনা রাজ্য পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিল। পামারষ্টোন এবং রাসেল পরিচালিত ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি ইটালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাহারা ইটালীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। ইংলণ্ডের এই কূটনৈতিক সমর্থনে ইটালীয়গণ উৎসাহিত হইয়াছিল। কাভুর মধ্য ইটালীর রাজ্যগুলির সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তিতে তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্মতি লাভ করিলেন এবং বিনিময়ে ফ্রান্সকে নীস ও স্যাভয় অর্পণ করিতে রাজী হইলেন। টাসকেনী, পার্মা মোডেনা এবং রোমাগনা রাজ্যগুলি গণভোটের দ্বারা সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইল। ভেনিস ব্যতীত সমগ্র উত্তর ইটালী একটি মাত্র রাজ্যে পরিণত হইল।

উত্তর ইটালীর ঐক্য

গ্যারিবল্ডী ও সহস্রের অভিযান ঃ উত্তর ইটালী যখন একটিমাত্র রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হইতেছিল তখন দক্ষিণ ইটালীতেও বিদ্রোহের আগুন

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সিসিলী ও নেপলসের বিদ্রোহী জনসাধারণকে গ্যারিবল্ডী পূর্বেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে উৎসাহিত হইয়া সিসিলীয়গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

গ্যারিবল্ডী বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সহস্র সেচ্ছাসেবক লইয়া বিখ্যাত 'রেড সার্ট' দল গঠন করিলেন। ১৮৬০ খৃঃ গ্যারিবল্ডী জাহাজযোগে

সিসিলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃটিশ নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি মারসালা নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি সিসিলী এবং নেপলস অধিকার করিলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যদলের এই দ্রুত সাফল্য ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা। নেপলস্ এবং সিসিলী ছিল স্বাধীন রাজ্য। এইজন্য কাভুরের পক্ষে গ্যারিবল্ডীকে দুইটি স্বাধীন রাজ্য আক্রমণে প্রকাশ্য সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। প্রকাশ্যে তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেও, গোপনে গ্যারিবল্ডীকে সাহায্য ও সমর্থন করেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডী সঙ্গে সঙ্গেই নেপলস্ ও সিসিলী ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে অর্পণ করিতে রাজী ছিলেন না। কাভুর গ্যারিবল্ডীর এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং গ্যারিবল্ডী যাহাতে কোন সংকট সৃষ্টি না করিতে পারেন সেইজন্য রাজা ইমানুয়েলকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। ভিক্টর ইমানুয়েল ক্যাসেলফিডারোর যুদ্ধে পোপের সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করিয়া আমব্রিয়া এবং মারসেস অধিকার করিলেন এবং দ্রুত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। নেপলস্এ গ্যারিবল্ডীর সহিত তাহার সাক্ষৎ হইল। ইতিমধ্যে সিসিলী, নেপলেস্, আমব্রিয়া এবং মারসেস'এর অধিবাসীগণ গণভোটের দ্বারা সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের সহিত সংযুক্ত হইবার সিদ্ধান্ত করিল। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া গ্যারিবল্ডী সমস্ত ক্ষমতা ইমানুয়েলের হস্তে অর্পণ করিলেন। সমস্ত সম্মান এবং পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করিয়া মাত্র এক থলি শস্য বীজ লইয়া গ্যারিবল্ডী মাতৃভূমি ক্যানবেরা দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই অপরিসীম ত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল।

সিসিলী ও নেপলস্ অধিকার

ইহার পর ইমানুয়েল ক্যাপুয়া অধিকার করিলেন। ভেনিস এবং রোম ব্যতীত সমগ্র ইটালী তাহার অধিকারে আসিল। ১৮৬১ খৃঃ ঐ দুইটি রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ইটালীর জনপ্রতিনিধিগণ তুরিণ এ সমবেত হইয়া ভিক্টর ইমানুয়েলকে ইটালীর রাজা ঘোষণা করিল। ১৮৬৬ খৃঃ অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময়ে অষ্ট্রিয়া ভেনিস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ভেনিস ঐক্যবদ্ধ

ভেনিস ও রোম অধিকার

ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৮৭০ খৃঃ ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সুযোগে ইমানুয়েল রোম অধিকার করিলেন। রোম ইটালীর রাজধানী হইল। ইটালী ঐক্যবিধান সম্পূর্ণ হইল।

জার্মানীর ঐক্য ১৮৫০-৭১

জার্মানীর অবস্থা ১৮১৫-৫০ঃ ইটালীর অপেক্ষা জার্মানীর সমস্যা ছিল আরও জটিল। জার্মানীতে প্রায় সাড়ে তিনশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। এই রাজ্যগুলির উপর অষ্ট্রিয়ার অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীজার্মানীতে উনচল্লিশটি রাজ্যের যে যুক্তরাষ্ট্র খাড়া করা হইয়াছিল তাহা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং ইহার উপর ছিল অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা। নেপোলিয়ন জার্মানীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিলোপ করিয়া জার্মানীর রাজনৈতিক জটিলতা অনেকখানি কমাইয়াছিলেন। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য সাধনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ছিল কারণ প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন মেটারনিকের পদাংক অনুসরণকারী। ১৮১৯ খৃঃ মেটারনিকের নেতৃত্বে জার্মানীর শাসকগণ এক ঘোষণা দ্বারা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহাই প্রতিক্রিয়াশীল চার্লসবাড ঘোষণা নামে পরিচিত। ১৮৩০ খৃঃ জুলাই বিপ্লবের সংবাদে যখন জার্মানীতে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, তখন কঠোর হস্তে সেই আন্দোলন দমন করা হয়। কিন্তু ১৮৪৮ খৃঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাফল্যের সংবাদ যখন জার্মানীতে পৌছিল তখন জার্মানীর সর্বত্র ব্যাপক গণআন্দোলন আরম্ভ হইল। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগণ গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক জার্মানগণ শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সংস্কার লাভে সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখিত। অতঃপর ভিয়েনায় যখন বিদ্রোহ দেখা দিল এবং প্রাণভয়ে মেটারনিক পলায়ন করিলেন তখন প্রাশিয়া, হ্যানোভার, স্যাকসনি

জার্মানীর সমস্যা

অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য, চার্লসবাড ঘোষণা

এবং ব্যাভেরিয়ায় গণআন্দোলনের জয় জয়কার হইল। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়াম জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ ফ্রাংকফুর্টে এক জাতীয় পার্লামেণ্ট আহূত হইল। এই পার্লামেণ্টে সমগ্র জার্মানীর জন্য একজন সম্রাট এবং দুইকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেণ্ট গঠনের সর্তসহ এক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইল। সম্রাটপদ গ্রহণের জন্য প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে আহবান করা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ইটালী এবং হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিয়া পুনরায় শক্তি সংহত করিয়াছিল। ফলে অষ্ট্রিয়ার সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনায় এবং জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত সিংহাসন গ্রহণ অসম্মানজনক মনে করিয়া ফ্রেডারিক পার্লামেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। ফলে দেশপ্রেমিক জার্মানদের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের আশা ধূলিসাৎ হইল। সর্বত্র বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ দমন করা হইল। ইহার পর ফ্রেডারিক জার্মান রাজ্যগুলির একটি সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনের এবং তাহার সভাপতিত্বে একটি পার্লামেণ্ট গঠনের প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য লুপ্ত হইত। সেইজন্য অষ্ট্রিয়া ১৮৫০ খৃঃ অলমুজ সম্মেলনে ফ্রেডারিককে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিল।

ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের প্রচেষ্টা ব্যর্থ

জোলভারিণ ঃ মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে জার্মানীর রাজনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হইলেও দুইটি কারণে জার্মানদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যবোধ জাগরিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ১৮১৮ খৃঃ প্রাশিয়ার প্রচেষ্টায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত তাহার এক অর্থনৈতিক ও শুল্ক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সংঘ জোলভারিণ নামে পরিচিত ছিল। জোলভারিণের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি পরস্পরের মধ্যে শুল্ক ব্যবস্থা তুলিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিত। ১৮৫০ খৃঃ অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর সমস্ত রাজ্য এই সংঘে যোগদান করিয়াছিল। এই বাণিজ্যিক ঐক্য নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ঐক্যের সোপান রচনা করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানীতে সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। হেগেল, ফিচ প্রভৃতি মনিষীগণ

ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হইবার ফলে জার্মানগণ জার্মানীর ঐক্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল।

প্রাশিয়ার নেতৃত্ব: ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হইবার ফলে ১৮৫০ খৃঃ পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ১৮৪৮ খৃঃ জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কেন্দ্রীয় সভার (Federal Diet) মাধ্যমে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব নহে কারণ ইহার সভাপতি ছিল অষ্ট্রিয়া।

অস্ট্রিয়া জার্মান ঐক্যের প্রতিবন্ধক

অষ্ট্রিয়া জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন এবং জার্মান জাতীয়তাবাদ দমন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সুতরাং কেন্দ্রীয় সভার অস্তিত্ব জার্মানীর ঐক্যের পথে বাধা হইয়াছিল। জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে তিনটি ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। অষ্ট্রিয়ার সভাপতিত্বে গঠিত জার্মান রাষ্ট্রসংঘ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ব্যপারে অষ্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে ও বিভিন্ন জার্মান রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করিতে হইবে এবং জার্মানীর ঐক্য বিধানে একটি জার্মান রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ঐ নেতৃত্বভার গ্রহণে একমাত্র প্রাশিয়াই সক্ষম ছিল। ইতিপূর্বে জোলভারিনের বা বাণিজ্য সংঘের নেতা হইয়াছিল প্রাশিয়া। সুতরাং জার্মানীর অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ছিলেন দুর্বল ও ভীতু। তাহার নেতৃত্বে প্রাশিয়া কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। এমন কি ১৮৪৮খৃঃ ফাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট যখন তাহাকে সমগ্র জার্মানীর সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল তখন অষ্ট্রিয়ার ভয়ে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ১৮৬১খৃঃ প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হইলেন। তিনি ছিলেন সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি দেখিলেন প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করিতে হইলে সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন প্রয়োজন।

সৈন্যবাহিনীর সংস্কার ঃ প্রথম উইলিয়াম অনুভব করিয়াছিলেন প্রাশিয়াকে জার্মানীর নেতৃপদ গ্রহণ করিতে হইলে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৮৪১খৃঃ পর প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করা হয় নাই। এইজন্য উইলিয়াম সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক পুনর্গঠন করিতে অগ্রসর হইলেন। সৈন্যবাহিনীর দ্বিগুণ শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি অধিক অর্থ মঞ্জুর এবং নূতন কর ধার্যের জন্য ডায়েটের (পার্লামেণ্ট) নিকট এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন। ডায়েটে উদারনৈতিকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাহারা সামরিক বিভাগের শক্তিবৃদ্ধির পূর্বে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী জানাইল এবং রাজার পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু ডায়েটের বিরোধিতা সত্বেও উইলিয়াম সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৮৬২ খৃঃ ডায়েট সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় অর্থের দাবী বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য করিল। তথাপি উইলিয়াম সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। ডায়েটের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিসমার্ককে প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন।

বিসমার্কের প্রথম জীবন ঃ ১৮১৫ খৃঃ বিসমার্কের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। ছাত্র জীবনে তিনি কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে প্রাশিয়ার বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই পদত্যাগ করিয়া জমিদারী দেখাশুনা করিতে থাকেন। ১৮৪৭খৃঃ তিনি সর্বপ্রথমে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং পরে ডায়েটের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক। সকল প্রকার গণতান্ত্রিক এবং উদারনৈতিক সংস্কারের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আট বৎসর যাবৎ তিনি ফ্রাংকফুর্টের ডায়েটে প্রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময়ে তিনি কূটনীতি এবং জার্মানীর জটিল রাজনীতি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন। জার্মান রাজ্যগুলির উপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিনষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য ফ্রাংকফুর্টে তিনি প্রাশিয়ার প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন। বিসমার্ক সুস্পষ্টভাবে অষ্ট্রিয়া বিরোধী

নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে অষ্ট্রিয়ার সহিত সংঘর্ষের সৃষ্টি হইতে পারে আশংকা করিয়া প্রাশিয়ার তদানীন্তন রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম তাহাকে রাশিয়ায় প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করিয়া সেণ্ট পিটার্সবার্গে প্রেরণ করেন। পরবর্তী রাজা প্রথম উইলিয়াম ১৮৬২ খৃঃ প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য তাহাকে বার্লিনে আহ্বান করেন।

প্রধান মন্ত্রী পদে বিসমার্কঃ প্রাশিয়ার এক সংকটজনক সময়ে বিসমার্ককে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হয়। রাজা এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিসমার্ক মনে প্রাণে ছিলেন রাজার প্রস্তাবিত সামরিক সংস্কারের গোঁড়া সমর্থক। তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ব্যতীত প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সুতরাং পার্লামেণ্টের জয় হইলে জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইবে। এইজন্য তিনি ঘোষণা করিলেন "সংখ্যাগরিষ্ঠদের বক্তৃতা ও প্রস্তাবের দ্বারা বর্তমানের বিরাট সমস্যাগুলির সমাধান হইবে না—রক্ত এবং অস্ত্রের জোরে সমাধান হইবে" ("Not by speeches and resolutions of the majorities are the great questions of the day to be decided, but by blood and iron".)। প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। ইহাই হইল বিসমার্কের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং নীতি। এই উদ্দেশ্য ও নীতিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিসমার্ক শাসনতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া ডায়েটের বিনা অনুমতিতে কর ধার্য ও আদায় করিতে লাগিলেন এবং এই অর্থের দ্বারা সৈন্যবাহিনীর

বিসমার্ক

শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। গণতান্ত্রিক দল তাহার কার্যাবলীর কঠোর নিন্দা করিল। কিন্তু বিসমার্ক সমস্ত নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করিয়া অচল, অটল রহিলেন।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি ঃ বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন ও বন্ধুত্ব অর্জন করা। জার্মান রাষ্ট্রসংঘ হইতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিতে হইলে তাহাকে কূটনৈতিক ভাবে নিঃসঙ্গ করা প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন এবং একটি বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা ফ্রান্সকে বহু সুযোগ সুবিধা প্রদান করিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি জারের নিষ্ঠুর দমনমূলক নীতি সমর্থন করিলেন। অথচ প্রাশিয়ার অধিকাংশ জনসাধারণ হতভাগ্য পোলদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিও পোলদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থন লাভের জন্য বিসমার্ক জারকে সাহায্য প্রদান করিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অষ্ট্রিয়া জার্মান রাষ্ট্রসংঘের কতকগুলি সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের এক সম্মেলন আহ্বান করে। অষ্ট্রিয়ার সহিত বৈরীভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিসমার্কের পরামর্শে রাজা উইলিয়াম এই সম্মেলন বর্জন করিলেন। ফলে অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

(১) শ্লেসুইগ-হলেষ্টিন সমস্যা ঃ বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানী হইতে বৈদেশিক প্রভাব বিনষ্ট করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা। তিনি ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের উন্নতি করিয়াছিলেন এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত বিরোধের সুযোগ খুঁজিতেছিল। শীঘ্রই বিসমার্কের সম্মুখে সেই সুযোগ আসিয়া গেল। জার্মানী এবং ডেনমার্কের মাঝখানে শ্লেসুইগ এবং হলেষ্টিন নামে দুইটি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল। রাজ্য দুইটি ছিল ডেনমার্কের রাজার অধীন, কিন্তু ডেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই দুইটি রাজ্যে ডেন এবং জার্মান উভয় জাতির অধিবাসী ছিল। আবার ১৮১৫ খৃঃ পর হইতে হলেষ্টিন ছিল জার্মান রাষ্ট্র সংঘের সদস্য। রাজ্য

দুইটিকে জার্মানগণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে এবং ডেনগণ ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিত। ১৮৪৮ খৃঃ ডেনমার্কের রাজা রাজ্য দুইটি ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলে অগষ্টেনবার্গের ডিউক রাজ্য দুইটির উপর অধিকার দাবী করিলেন এবং প্রাশিয়া ডেনমার্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

ডেনমার্কের সহিত বিরোধ

১৮৫২ খৃঃ লণ্ডন সন্ধি দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা করা হয়। ইহার সর্ত অনুযায়ী রাজ্য দুইটি ডেনমার্কের অধীন রহিল। কিন্তু ডেনমার্কের সহিত সম্পূর্ণ সংযুক্তি নিষিদ্ধ করা হইল। অগষ্টেনবার্গের ডিউক ডেনমার্কের রাজার নিকট তাহার ডেনমার্কের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ খৃঃ পুনরায় সমস্যা জটীল হইয়া উঠিল। ডেনমার্কের রাজা জনসাধারণের চাপে পড়িয়া শ্লেস্‌ইগ ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং হলেষ্টিনের উপর ডেনমার্কের অধিকার সুদৃঢ় করিলেন। ফলে পুনরায় শ্লেস্‌ইগ-হলেষ্টিন সমস্যার উদ্ভব হইল। বিসমার্ক এই সুযোগে রাজ্য দুইটি জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি ক্ষুদ্ধ অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। অতঃপর প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া ডেনমার্কের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিয়া লণ্ডন চুক্তির সর্তভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিল এবং শ্লেস্‌ইগ-হলেষ্টিনের ডেনমার্কের সহিত সংযুক্তি প্রত্যাহারের দাবী করিল। কিন্তু ডেনমার্ক এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিল। ফলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ডেনমার্ক আক্রমণ করিয়া ডেনদের পরাজিত করিল। ভিয়েনার সন্ধি (১৮৬৪) অনুযায়ী ডেনমার্ক রাজ্য দুইটির উপর সকল দাবী পরিত্যাগ করিল এবং অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবে তাহাই মানিয়া লইতে রাজী হইল।

লণ্ডনের সন্ধি

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া কর্তৃক ডেনমার্ক আক্রমণ; শ্লেস্‌ইগ, হলেষ্টিন অধিকার

কিন্তু রাজ্য দুইটির ভবিষ্যৎ লইয়া অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। বিসমার্ক ইহাই চাহিতেছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য দুইটি প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু অষ্ট্রিয়া রাজ্য দুইটি অগষ্টেনবার্গের ডিউককে অর্পণ করিতে চাহিল। ১৮৬৫ খৃঃ গ্যাষ্টিন সম্মেলনে স্থির করা

হইল যে চূড়ান্ত কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত শ্লেসুইগ প্রাশিয়া এবং হলেষ্টিন অষ্ট্রিয়ার অধিকারে থাকিবে। ফলে অগষ্টেনবার্গের ডিউকের দাবী অগ্রাহ্য করা হইল এবং শ্লেসুইগ প্রাশিয়ার অধিকারে আসিল। গ্যাষ্টিন সম্মেলন বিসমার্কের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচয়।

গ্যাষ্টিন সম্মেলন

(২) **অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধ ১৮৬৬ঃ** হলেষ্টিন ছিল প্রাশিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং হলেষ্টিনের উপর অষ্ট্রিয়ার অধিকার বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। এইজন্য অষ্ট্রিয়া গ্যাষ্টিন সম্মেলনের ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহার সভাপতিত্বে গঠিত জার্মান রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় ডায়েটে সমস্ত বিষয়টি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে অষ্ট্রিয়া অগষ্টেনবার্গের ডিউকের দাবীর প্রতিও প্রছন্ন সমর্থন জানাইল। বিসমার্কও ইহাই চাহিতেছিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গ্যাষ্টিন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্যের অভিযোগ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের জন্য তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তিনি অষ্ট্রিয়াকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করিলেন। তিনি ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাইন অঞ্চল বা বেলজিয়ামের অংশ বিশেষ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া, ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা আদায় করিয়া লইলেন। অতঃপর বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইটালীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ ইটালী ভেনিস পাইবে। বিসমার্ক ইতিপূর্বেই পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিয়া রাশিয়ার সমর্থন ও শুভেচ্ছা অর্জন করিয়াছিলেন। এইভাবে অষ্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিসমার্ক যুদ্ধ ঘোষণার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন শ্লেসুইগ-হলেষ্টিন সমস্যা ফেডারেল ডায়েটে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রিয়া গ্যাষ্টিন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছে। সুতরাং গ্যাষ্টিন সম্মেলনের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহার পর বিসমার্ক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া হলেষ্টিন হইতে অষ্ট্রিয়বাহিনীকে বহিষ্কার করিলেন। চতুর বিসমার্ক ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি

অস্ট্রিয়া কূটনৈতিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন

বিসমার্ক কর্তৃক হলেষ্টিন অধিকার

ফেডারেল ডায়েট বা পার্লামেন্ট হইতে অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ডায়েট পুনর্গঠনের দাবী জানাইলেন। স্বভাবতঃই অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল এবং হলেষ্টিনে অষ্ট্রিয়ার অধিকার লংঘন করিবার জন্য প্রাশিয়াকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য সমাবেশ করিল। ইহার প্রতিবাদে প্রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিল এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল—দেখান হইল যেন প্রাশিয়া আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে।

যুদ্ধ আরম্ভ

এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী দশ দিনের মধ্যে হেস-ক্যাসেল, হ্যানোভার এবং স্যাক্সনি অধিকার করিল এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি প্রাশিয়ার পদানত হইল। ইহার পরই স্যাডোয়ার যুদ্ধে (১৮৬৬) অষ্ট্রিয়ার বিরাট সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ভীত হইয়া অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। বিসমার্ক বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের আশংকায় দ্রুত যুদ্ধের নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন। অষ্ট্রিয়াকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য প্রাশিয়ার রাজার অসম্মতি উপেক্ষা করিয়া তিনি ভিয়েনা অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। ভীত অষ্ট্রিয়া প্রাগের সন্ধি (১৮৬৬) দ্বারা প্রাশিয়ার সহিত শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। অষ্ট্রিয়া জার্মানীতে সকল আধিপত্য প্রত্যাহার করিল; জার্মান রাষ্ট্রসংঘ (German Confedaration) ভাঙিয়া দিল, ভেনিস ইটালীকে প্রদান করিল। শ্লেস্‌ইগ—হলেষ্টিনে নিজ অধিকার প্রাশিয়াকে অর্পণ করিল এবং ভবিষ্যতে প্রাশিয়া কর্তৃক জার্মানীর পুনর্গঠন স্বীকার করিতে রাজী হইল। ইহার পর শ্লেস্‌ইগ-হলেষ্টিন, হ্যানোভার, ন্যাসাউ, ফ্রাংকফুর্ট প্রভৃতি রাজ্য ও সহরগুলি প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ফলে প্রাশিয়ার সীমানা বহুদূর বিস্তৃত হইল। মেইন নদীর উত্তরদিকের রাজ্যগুলিকে লইয়া উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা হইল। এই সংঘের সভাপতি হইলেন প্রাশিয়ার রাজা। প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা গঠন করা হইল। দক্ষিণ জার্মানীর

স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়

প্রাগের সন্ধি

রাজ্যগুলির স্বাধীনতায় প্রাশিয়া হস্তক্ষেপ করিল না। এই ভাবে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হইল। অষ্ট্রিয়া জার্মানী হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত হইল, প্রাশিয়া বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইল, তাহার সামরিক খ্যাতি বৃদ্ধি পাইল। অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে ভেনিস লাভ করিবার ফলে রোম ব্যতীত সমগ্র ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি সফল হইল। এই পরাজয়ের ফলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যও পুনর্গঠিত হইল। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট অবশ্য উভয় অংশের সম্রাট রহিলেন। কিন্তু হাঙ্গেরীর জন্য পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইল।

উত্তর জার্মানীর ঐক্য সাধন

(৩) ফ্রাংকো-প্রাশিয়া যুদ্ধ ১৮৭০-৭১ ঃ অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্যের ফলে বিসমার্কের 'অস্ত্র ও রক্তের' নীতির জয় জয়কার হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে তখনও প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ফ্রান্স ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠন সুনজরে দেখে নাই। কারণ শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র গঠিত হইলে ফ্রান্সের বিপদের কারণ হইবে। জার্মানীর ঐক্য বিধান সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ফ্রান্সকে কূট-নৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের সম্পর্কের অবনতি হইয়াছিল। অন্যদিকে প্রাশিয়ার সহিত রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রতি উদার ব্যবহার করিয়াছিল। প্রাশিয়ার উদারতায় অষ্ট্রিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রাশিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিল। বিসমার্ক ইটালীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের পুরস্কার স্বরূপ ইটালীকে রোম প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইল।

যুদ্ধের প্রয়োজন

ফ্রান্স কূটনৈতিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন

স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় পৌঁছিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং রণক্লান্ত হইয়া উভয় পক্ষই তাহাকে মধ্যস্থতা করিতে আহ্বান করিবে। কিন্তু তাহার আশা ফলবতী হইল না। বরং প্রাশিয়ার শক্তি এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। জার্মানীকে বিভক্ত এবং দুর্বল করিয়া রাখাই ছিল ফ্রান্সের নীতি। স্যাডোয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের সেই নীতি ব্যর্থ হইল। এই জন্যই বলা হইয়াছে "স্যাডোয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সই পরাজিত হইয়াছিল।" (It was France that was defeated at Sadowa).

তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যর্থতা

সুতরাং সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার শক্তি চূর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। ফ্রান্সের মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে সম্রাটের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইয়াছিল—সিংহাসন টলমল করিতেছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে হইলে কিছু করা প্রয়োজন। অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময় তাহার নিরপেক্ষতার জন্য প্রাশিয়া তাহাকে রাইন অঞ্চল বা বেলজিয়ামের কয়েকটি অঞ্চল প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাইন অঞ্চল অথবা বেলজিয়ামের কয়েকটি অঞ্চল দাবী করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল—আন্তর্জাতিক অবস্থাও প্রাশিয়ার অনুকূল, সুতরাং বিসমার্ক এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন হল্যাণ্ডের নিকট হইতে লুক্সেমবার্গ ক্রয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে জার্মানীতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ইউরোপের শক্তিবর্গ লুক্সেমবার্গকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিল। বারংবার ব্যর্থ হইয়া তৃতীয়

যুদ্ধের প্রয়োজন

নেপোলিয়ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিসমার্কও ইহাই চাহিতেছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে আক্রমণকারী প্রমাণ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল।

স্পেনে এক বিদ্রোহের ফলে বুরবণ বংশীয় সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা বিতাড়িত

হইয়াছিলেন এবং হোয়েনজোলার্ণ বংশীয় লিওপোল্ডকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু লিওপোল্ড ছিলেন প্রাশিয়ার রাজার আত্মীয়। সুতরাং তাহার সিংহাসনে আরোহণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে লিওপোল্ড সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার নিকট ভবিষ্যতে লিওপোল্ডের প্রার্থীপদ সমর্থন না করিবার প্রতিশ্রুতি দাবী করিলেন। কিন্তু প্রাশিয়া এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিল। এই সময় প্রাশিয়ার রাজা এমস্ নামক স্থান হইতে বিসমার্ককে একখানি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ইহাতে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সহিত তাহার সাক্ষাতের বিবরণ ছিল। সুচতুর বিসমার্ক এই টেলিগ্রামখানি এমনভাবে প্রকাশ করিলেন যাহাতে দেখান হইল ফরাসী রাষ্ট্রদূত প্রাশিয়ার রাজার নিকট অপমানিত হইয়াছেন। বিসমার্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। কারণ এই সংবাদে ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ১৮৭০ খৃঃ ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

স্পেনের সিংহাসন লইয়া বিরোধ

এমস টেলিগ্রাম

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিসমার্ক ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে জার্মান জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার সহিত যোগদান করিল। ওয়ার্থ এবং গ্রাভেলফ'এর যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হইল। অতঃপর সেডানের রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া সমগ্র ফরাসী বাহিনী প্রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন। সেডানের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদে ফ্রান্সের জনসাধারণ পুনরায় ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিল। বিজয়ী জার্মান বাহিনী প্যারিস অবরোধ করিল। ফরাসীগণ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও রাজধানী রক্ষা করিতে পারিল না। প্যারিসের পতন হইল। পরাজিত ফ্রান্স সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। ফ্রাংকফুর্টের সন্ধি দ্বারা উভয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্স জার্মানীকে আলসেস-লোরেন

সেডানের যুদ্ধ

অঞ্চল অর্পণ করিল—প্রচুর ক্ষতি পূরণ প্রদান করিল এবং ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ফ্রান্সে একদল জার্মান সৈন্য রাখিতে সম্মত হইল।

এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র জার্মানী একটিমাত্র রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হইল।
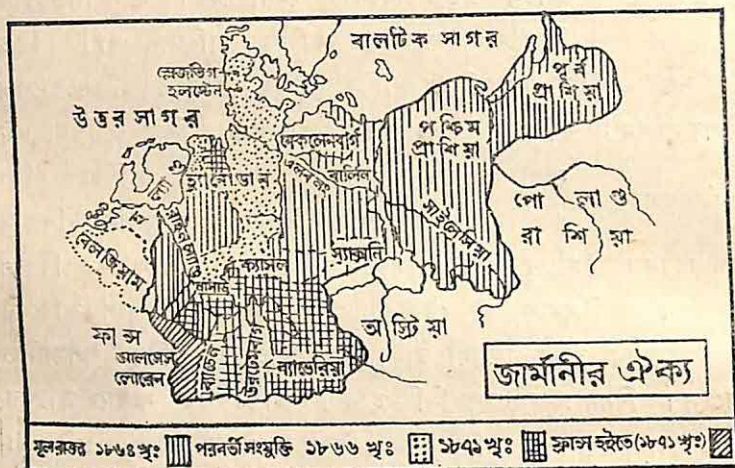
প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়ামকে জার্মানীর সম্রাট ঘোষণা করা হইল এবং দুইকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেণ্ট গঠন করা হইল। জার্মানী ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। রোম ইটালীর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ইটালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হইল। ফ্রান্সে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

ফলাফল

ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র : তৃতীয় নেপোলিয়ন

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : ১৮৪৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে লুই ফিলিপি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইবে বিপ্লব সার্থক হইয়াছিল, কারণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের নেতৃবর্গের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলির ফলে

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী দলের নায়ক ছিলেন ল্যামার্টিন এবং সমাজতন্ত্রীদের নায়ক ছিলেন লুই ব্ল্যাংক। ল্যামার্টিন অস্থায়ী সরকারে কয়েকজন সমাজতন্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সাময়িক ভাবে উভয়দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা দাবী করিল প্রতিটি শ্রমিককে কার্যে নিযুক্ত করিবার দায়িত্ব সরকারের (Right to employment)। এইজন্য তাহারা জাতীয় কর্মশালা (National workshop) খুলিল। এখানে প্রতিটি বেকার ব্যক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু এই বৈপ্লবিক কর্মসূচী নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের পছন্দ হইল না। সুতরাং পুনরায় বিরোধ আরম্ভ হইল।

অতঃপর স্থায়ী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। এই নির্বাচনে কৃষক শ্রেণীর একচেটিয়া ভোটে জাতীয় সভায় নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। পরাজিত সমাজতন্ত্রী দল সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু কঠোর হস্তে তাহাদের বিদ্রোহ দমন করা হইল।

জাতীয় সভা প্রজাতন্ত্রের জন্য নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিল। এক কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সভা এবং রাষ্ট্রপ্রধান পদে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইল। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হইবে চারি বৎসর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নেপোলিয়ন পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী লুই নেপোলিয়ন প্রায় পাঁচ লক্ষ ভোটে জেনারেল কেভেনাককে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। 'নেপোলিয়ন' নামের জোরেই তিনি এই বিরাট সাফল্য অর্জন করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে 'নেপোলিয়ন' নামের প্রতি ফরাসী জনসাধারণের অদ্ভূত মোহ ছিল।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন ঃ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া লুই নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্র এবং নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহন করিলেও, তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করা। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ছিল দুর্বল। ১৮৪৯ খৃঃ নূতন আইন সভার নির্বাচনে

প্রজাতন্ত্র বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। ইতিপূর্বে নেপোলিয়ন নামের জন্যই লুই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রজাতন্ত্রের প্রতি জনসাধারনের আনুগত্য গভীর ছিল না। নেপোলিয়ন ইহা উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণের আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে সার্বজনীন ভোটাধিকার দানের জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আইনসভা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে তিনি বলপূর্বক বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন (১৮৫১)। শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এবং রাষ্ট্রপতি পদে দশ বৎসরের জন্য নির্বাচনের আবেদন জানাইয়া নেপোলিয়ন গণভোট গ্রহণ করিলেন। বিপুল ভোটে জনসাধারন তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করিল। ১৮৫২ খৃঃ নেপোলিয়ন নূতন সংবিধান প্রচলিত করিলেন। অতঃপর আর একটি গণভোটে ফ্রান্সের জনসাধারণ নেপোলিয়নকে সম্রাট ঘোষণা করিল। লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের নীতি ও কার্যাবলীঃ নামের জোরে নেপোলিয়ন সম্রাট পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জনসাধারণ আশা করিয়াছিল তিনি প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় আভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন এবং উগ্র পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। তিনিও জনসাধারনের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য দেশের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। নূতন নূতন রেলপথ নির্মাণ করা হয় এবং ধীরে ধীরে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন করা হয়। ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। দরিদ্র জনসাধারণকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়ন সমবায় সমিতি এবং শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করেন। তিনি শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার অধিকারও স্বীকার করিয়া লন। নেপোলিয়ন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া প্যারিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

আভ্যন্তরীন নীতি

কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন জানিতেন আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধান করিলেও উগ্র এবং চমকপ্রদ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ না করিলে তিনি ফরাসী

জাতির হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবেন না। তাহার পররাষ্ট্র নীতি সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পরই তিনি ম্যাটসিনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোমের প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফলে তিনি ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে পরিগণিত হইলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া জার নিকোলাসকে পরাজিত করিয়া প্রথম নেপোলিয়নের মস্কৌ অভিযানে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাহার কৃতিত্বের ফলে প্যারিসেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্যারিস পুনরায় ইউরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থকরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়া রাজ্য দুইটিকে একত্র করিয়া রুমানিয়া গঠন সমর্থন করেন। তিনি ইটালীর ঐক্য প্রচেষ্টায় সার্ডিনিয়ার সহিত যোগদান করিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সম্পূর্ণ জয়লাভের পূর্ব হঠাৎ ভিলা-ফ্রাংকার সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইহার পরই টাসকেনী, মোডেনা এবং পার্মা'র সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্তি সমর্থন করিলেন এবং পরিবর্তে নীস এবং স্যাভয় লাভ করিলেন। ১৮৬০ খৃঃ নেপোলিয়ন সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করেন। ইহার পর হইতে তাহার পতন আরম্ভ হইল। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ সমর্থন করিলেন। কিন্তু জার নির্মম হস্তে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং নেপোলিয়নের কার্যে ক্রুদ্ধ হইলেন। সুতরাং নেপোলিয়নের নীতি ব্যর্থ হইল। তিনি মেক্সিকোর সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধের সুযোগে ফরাসী সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার মনোনীত প্রার্থীকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো হইতে ফরাসীদের বহিস্কৃত করিল। ১৮৬৪ খৃঃ কোচিন-চীন ফরাসী সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চীনে ফরাসী বণিকগণ বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ক্যাথলিক এবং ফরাসীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য তিনি সিরিয়ায় এক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু মেক্সিকো অভিযান ব্যর্থ

পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য

ব্যর্থতা

হইবার ফলে তাহার গৌরব ম্লান হইয়া গেল। বিসমার্কের নীতির ফলে ফ্রান্সের মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মানীতে ফ্রান্সের স্বার্থ বিপদগ্রস্থ হইয়াছিল। নেপোলিয়ন উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার বিপদ আসন্ন। দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সমর্থনের আশায় তিনি একাধিক গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ তিনি

পতন

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনসভা করিবার অবাধ অধিকার প্রদান করেন। শাসনতন্ত্রের সংস্কার করা হইল। অতঃপর প্রাশিয়ার শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ১৮৭০ খৃঃ সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। ফ্রান্সে পুনরায় রাজতন্ত্রের পতন হইল এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা করা সহজসাধ্য নহে। তাহার চরিত্রে পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ কেহ তাহার নিন্দা এবং কেহ বা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে নেপোলিয়ন নামের মাহাত্ম্যে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল না। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে তিনি প্রথমে ম্যাটসিনির রোম প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া পোপের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আবার পরে সর্ডিনিয়ার রাজার সহিত যোগদান করিয়া তিনি ইটালীর জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু সার্ডিনিয়ার সহিত পরামর্শ না করিয়াই তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিলাফ্রাংকার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। দেশপ্রেমিক ইটালীয়গণ তাহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অহিভিত করিল। অষ্ট্রিয়াও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়; নীস এবং স্যাভয় অধিকার করায় ইংলণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। তিনি জার্মানীতে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার বিরোধে মধ্যস্থতা করিবার আশা

তৃতীয় নেপোলিয়ন

করিয়াছিলেন। কিন্তু স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে তাহার নিরপেক্ষ নীতি ব্যর্থ হইল। ফ্রান্সের জনসাধারণ ব্যর্থতার জন্য তাহাকে নিন্দা করিল। অতঃপর বিসমার্কের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। পূর্ব্বেই অষ্ট্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া প্রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বিসমার্কের কূটনীতি বুঝিতে পারেন নাই। ফলে তাহার বিপর্যয় হইয়াছিল।

প্রাচ্য সমস্যা (Eastern Question)

প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব ঃ পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে তুরস্কের (অটোম্যান) সাম্রাজ্য ছিল অন্যতম। অষ্টদাশ শতাব্দীতে এই বিশাল সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৬৯৯ খৃঃ হাঙ্গেরী তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। এবং ১৮১২ খৃঃ বুখারেষ্টের সন্ধির দ্বারা তুরস্ক বেসারাভিয়া রাশিয়াকে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ইহাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নেপোলিয়ন যখন মিশর ও সিরিয়া বিজয়ে অগ্রসর হন তখন প্রাচ্য সমস্যার প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ইউরোপের শক্তিবর্গের ভয় হইয়াছিল রাশিয়া যদি দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করে তাহা হইলে ইউরোপের শক্তিসাম্য বিনষ্ট হইবে তুরস্ক বিলুপ্ত হইলে যে বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হইবে তাহা ইউরোপের পক্ষে অশুভ হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বলকান অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দানিয়ুব হইতে ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। এখানে গ্রীক, সার্ব, বুলগার এবং আলবেনীয় জাতিসমূহের বসবাস ছিল। দানিয়ুবের উত্তরে অবস্থিত হইলেও রুমানিয়াও বলকান অঞ্চলের সহিত বিভিন্ন ভাবে সংযুক্ত ছিল। বলকান অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান। তুরস্কের নির্মম শাসনে তাহারা নিপীড়িত হইত। রাশিয়া ছিল বলকান অঞ্চলের প্রতিবেশী। বলকানদের ন্যায় রাশিয়ানরাও হইল একই শ্লাভ জাতিভুক্ত এবং ধর্মের দিক হইতে গ্রীক চার্চের অধীন। সুতরাং রাশিয়া তুরস্কের

বিরুদ্ধে বলকানদের জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করিত। তুর্কী সাম্রাজ্যকে বিনষ্ট করিয়া আধিপত্য বিস্তার করা এবং কৃষ্ণ সাগর ও ভূমধ্য সাগরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল রাশিয়ার উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের জাতীয়তাবাদের ঢেউ বলকান অঞ্চলে পৌছিয়াছিল। বলকান অঞ্চলের খৃষ্টানগণ তুরস্কের শাসনমুক্ত হইতে চাহিল। ফলে আরম্ভ হইল যুদ্ধ-বিগ্রহ। তুরস্কের দুর্বলতার ফলে বৈদেশিক আক্রমণ, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খৃষ্টান অধিবাসীদের বিদ্রোহ এবং রক্তপাত ও বিভিন্ন শক্তির স্বার্থের সংঘাত হইতে প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

ইউরোপের শক্তিগুলির উদ্দেশ্য ও নীতি ঃ প্রাচ্য সমস্যার প্রতি ইউরোপের শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিভিন্ন। বলকান অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত রাশিয়ার ধর্মীয় এবং জাতিগত সম্পর্ক ছিল। এইজন্য রাশিয়া তুরস্কের শোষণ হইতে বলকান অঞ্চলের জাতিগুলিকে রক্ষার অধিকার দাবী করিত। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করা। ইহা অসম্ভব হইলে তুরস্কের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, ইহাকে একটি অধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। ১৭৭৪ খৃঃ কুচুক-কাইনার্ডজির সন্ধি এবং ১৮১২ খৃঃ বুখারেষ্টের সন্ধির ফলে রাশিয়া তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু নিকট প্রাচ্যে এবং ভূমধ্য-সাগরে রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থ বিপন্ন হইত। সুতরাং ইংলণ্ডের নীতি ছিল রাশিয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন রোধ করা। সুতরাং স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংলণ্ড তুরস্কের রক্ষাকর্তা রূপে আবির্ভূত হইল। বলকানদের জাতীয় আন্দোলনে রাশিয়ার সমর্থনে অষ্ট্রিয়া ভীত হইয়াছিল। কারণ অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের মধ্যেও বহু সংখ্যক শ্লাভ অধিবাসী ছিল। সুতরাং বলকান অঞ্চলে শ্লাভদের জাতীয় আন্দোলন অষ্ট্রিয়ার অভ্যন্তরেও বিস্তৃত হইবার আংশকা ছিল। বলকান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইল। বলকান অঞ্চলে শ্লাভ রাজ্য সার্বিয়াকে দুর্বল করাই ছিল অষ্ট্রিয়ার নীতি। ইহা ব্যতীত দানিয়ুব অঞ্চলে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অষ্ট্রিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত

ক্ষতি হইত। ফ্রান্সের সহিত তুরস্কের বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় যোগসূত্র ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যে ফ্রান্স অনেক বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত। প্রাচ্যের রোমান ক্যাথলিকদের রক্ষাকর্তা ছিল ফ্রান্স। সুতরাং ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগরে ও তুরস্কে তাহার নৌ ও বাণিজ্যিক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা। জার্মানী পূর্বে প্রাচ্য সমস্যার প্রতি দৃক্‌পাত করে নাই। কিন্তু ১৮৭৮ খৃঃ হইতে জার্মানী নিকট-প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল।

প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) পর্যন্ত ঘটনাবলী ঃ দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যকে বলা হইত 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' (Sick man of Europe)। বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীদের লইয়া গঠিত সুবৃহৎ তুর্কী সাম্রাজ্যে কোন সুদৃঢ় ঐক্য গড়িয়া ওঠে নাই, ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তুরস্কের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

তুরস্কের অবস্থা

বলকান অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলন তুর্কী সাম্রাজ্যে গভীর সংকটের সৃষ্টি করিয়াছিল। সামরিক শক্তির জোরে বিরাট তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সামরিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল তখনই সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন আরম্ভ হইল। দুইটি কারণে সাম্রাজ্যের পতন হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। প্রথমতঃ তুরস্কের সামরিক শক্তি হ্রাস পাইলেও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৮০৪ খৃঃ বলকান অঞ্চলে সার্বিয়ার ব্যাপক জাতীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কারা জর্জ। কিন্তু তুরস্ক এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৮১৭ খৃঃ কারা জর্জকে নিহত করিয়া মাইলোস জাতীয়

সার্বিয়ার বিদ্রোহ

আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তুরস্কের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত তুরস্ক সার্বিয়াকে স্বায়ত্ব-শাসন প্রদান করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য সার্বিয়া তুরস্কের সুলতানকে বার্ষিক কর প্রদানে স্বীকৃত হয়।

ইহার পরই তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে গ্রীকগণ শাসনকার্যে এবং ব্যবসা

বাণিজ্যে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রীকগণ স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট হইল। ১৮২১ খৃঃ জানিনার তুর্কী শাসনকর্তা আলি পাশা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই সুযোগে মোলডাভিয়া এবং দক্ষিণ গ্রীসের মোরেয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্ক মোলডাভিয়ার বিদ্রোহ দমন করে কিন্তু মোরেয়ার বিদ্রোহ ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ছয় বৎসর ইউরোপের শক্তিগুলি নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু ১৮২৭ খৃঃ এথেন্সের পতন হইলে গ্রীকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইউরোপের জনসাধারণ গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তুর্কী সৈন্য-বাহিনীর নিষ্ঠুরতায় সমগ্র ইউরোপে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং ফ্রান্স তুরস্কের নিকট যুদ্ধ বিরতি এবং তাহাদের মধ্যস্থতা স্বীকারের জন্য দাবী জানাইল। কিন্তু তুরস্ক ইহা অগ্রাহ্য করায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নৌবহর নাভারিনোর যুদ্ধে তুরস্কের নৌবহর ধ্বংস করিল। ইংলণ্ড পরে এই সংঘর্ষ হইতে সরিয়া গেল কিন্তু রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধ করিয়া তুরস্ককে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিল। আড্রিয়ানোপলের সন্ধি দ্বারা (১৮২৯) তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল এবং ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়াকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করিল। অড্রিয়ানোপলের সন্ধি রাশিয়ার বিরাট সাফল্যের পরিচয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইহার পরই তুরস্কের সুলতান আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন মেহমেত আলি (পাশা)। মেহমেত আলি ছিলেন আলবেনীয়, উচ্চাকাংখী এবং ক্ষমতা-বান পুরুষ। নেপোলিয়নের মিশর অধিকারের সময় তিনি মিশরে আসিয়া-ছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন কর-আদায়কারী, পরে তামাক-ব্যবসায়ী এবং তারপর তুর্কী বাহিনীর একজন সেনাপতি এবং সর্বশেষে মিশরের শাসনকর্তা। গ্রীকযুদ্ধে তিনি তুরস্কের আভ্যন্তরীন দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গ্রীক যুদ্ধে সাহায্যের পুরস্কার

মেহমেত আলি

স্বরূপ সুলতান তাহাকে ক্রীট দ্বীপ প্রদান করেন। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি বলপূর্বক সিরিয়া অধিকার করেন এবং তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অধিকার করিতে অগ্রসর হন। বিপদগ্রস্থ সুলতান বৃহৎ শক্তিগুলির নিকট সাহায্যের আবেদন করিলেন। কিন্তু রাশিয়া ব্যতীত কোন রাষ্ট্র সাহায্য প্রদান করিল না। আনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি (১৮৩৩) দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে দার্দানেলিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার আদায় করিয়া লইল। ইহা রাশিয়ার বিরাট সাফল্যের পরিচয়। তুরস্কে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তৃত হইল এবং কৃষ্ণসাগর রাশিয়ার একটি হ্রদে পরিণত হইল। (Black sea became a Russian Lake)। কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ড ভীত হইল। কারণ তুর্কী সাম্রাজ্যে রুশ আধিপত্য বিস্তৃত হইলে প্রাচ্যে ইংলণ্ডের স্বার্থ বিপন্ন হইত। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী পামারষ্টোন এই সন্ধি পুনরায় আলোচনার দাবী জানাইলেন। মিশর ও সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের আশায় ফ্রান্স গোপনে মেহমেত আলিকে সাহায্য করিতেছিল। রাশিয়াও মেহমেত আলির সাফল্য সুনজরে দেখে নাই।

আনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি

ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সকে না জানাইয়াই লণ্ডন সম্মেলনে মিলিত হইয়া মেহমেত আলিকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য করিল। লণ্ডনের সন্ধি (১৮৪১) দ্বারা মেহমেত আলি সিরিয়া পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তুরস্কের অধীনে মিশরের বংশানুক্রমিক পাশা বা শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। যুদ্ধের সময় দার্দানেলিসে সকল যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হইল। সুতরাং পামারষ্টোনের নীতি সফল হইল, রাশিয়ার অগ্রগতি রুদ্ধ হইল, ফ্রান্সের চক্রান্ত বিনষ্ট হইল।

লণ্ডনের সন্ধির পর দশ বৎসর তুর্কী সাম্রাজ্যে শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু শীঘ্রই নূতন সংকট দেখা দিল। পুরানো এক চুক্তির দ্বারা তুরস্কের সুলতান তুরস্কের সাম্রাজ্যে বসবাসকারী ল্যাটিন ধর্মযাজক (রোমান ক্যাথলিক) বা মঠবাসীদের উপর ফ্রান্সের অভিভাবকত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে যখন বিপ্লব

রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ

চলিতেছিল তখন ধীরে ধীরে গ্রীক ধর্মযাজকগণ ল্যাটিন ধর্মযাজকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছিল। রাশিয়া গ্রীক খৃষ্টানদের অভিভাবকত্ব দাবী করিত। তৃতীয় নেপোলিয়ন সুলতানের নিকট ল্যাটিন খৃষ্টানদের সমস্ত অধিকার পুনঃ প্রদানের দাবী করিলেন। জার নিকোলাসও গ্রীক খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন অধিকার দাবী করিলেন। জেরুজালেমের পবিত্র স্থান গুলির উপর অধিকার লইয়া উভয় পক্ষে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ

১৮৫৩ খৃঃ রাশিয়ায় নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের নিকট জার প্রথম নিকোলাস তুর্কী সাম্রাজ্য ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করেন। ইংলণ্ড এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর জার সুলতানের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলির উপর ল্যাটিন খৃষ্টানদের অধিকার এবং ল্যাটিন খৃষ্টানদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব দাবী করিলেন। কিন্তু সুলতান এই দাবী সম্পূর্ণ স্বীকার না করায় রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়া অধিকার করিল। রাশিয়ার এই আক্রমণাত্মক কার্যে ক্রুদ্ধ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং তুরস্কের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিল (ভিয়েনা নোট)। এই প্রস্তাবের ভাষ্য লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। হয়ত এই বিরোধ মীমাংসা করা সম্ভব হইত কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের পরামর্শে তুরস্কের সুলতান চতুঃশক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, যদিও রাশিয়া চতুঃশক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল।

অতঃপর তুরস্ক রাশিয়ার নিকট ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়া হইতে সৈন্য অপসারণের দাবি করিল। কিন্তু রাশিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু সিনোপের নৌযুদ্ধে রাশিয়া তুরস্কের নৌবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করিল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়া হইতে সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স রাশিয়ার নিকট চরম পত্র প্রেরণ করিল। কিন্তু রাশিয়া চরম পত্র অগ্রাহ্য করায় উভয় শক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৫৪)। পর বৎসর সার্ডিনিয়া-

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

পিডমণ্ট মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। অষ্ট্রিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে এবং সামরিক কারণে রাশিয়া ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার শক্তি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ক্রিমিয়ায় অবতরণ করিল এবং সিবাষ্টোপোল অভিমুখে অগ্রসর হইল। আল্মা নদীর যুদ্ধে রুশ বাহিনী পরাজিত হইল। অতঃপর মিত্রপক্ষীয় সৈন্য বাহিনী সিবাষ্টোপোল অবরোধ করিল। বালাক্লাভা এবং ইংকারমানের যুদ্ধে রুশ বাহিনী পরাজিত হইল। একবৎসর পর সিবাষ্টোপোলের পতন হইল। ইতিমধ্যে জার নিকোলাসের মৃত্যু হইয়াছিল। রাশিয়া বারংবার পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল।

প্যারিসের সন্ধি

প্যারিসের সন্ধি দ্বারা (১৮৫৬) ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হইল। ওয়ালাচিয়া এবং মোলডাভিয়াকে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হইল; রাশিয়া তুরস্কের অধীন খৃষ্টানদের উপর অভিভাবকত্বের দাবী প্রত্যাহার করিল। কৃষ্ণসাগর নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং যুদ্ধজাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হইল। রাশিয়া বেসারাভিয়া পরিত্যাগ করিল। দানিয়ুব আন্তর্জাতিক নদী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইউরোপের 'রুগ্ন মানুষ' তুরস্ক আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে; (১) তুরস্ক ও নিকট-প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি রুদ্ধ হইল; (২) তুরস্ক সাময়িকভাবে রক্ষা পাইল। (৩) ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে তৃতীয় নেপোলিয়ান সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং প্যারিস সম্মেলনে সার্ডিনিয়ার মন্ত্রী কাভুর ইটালীর সমস্যার প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; (৪) রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল; (৫) রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। (৬) এই যুদ্ধের পর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি এক ঘোষণা দ্বারা সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু প্যারিসের সন্ধি প্রাচ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান করিতে পারে নাই। রাশিয়া এই অপমানজনক সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ফলাফল

প্যারিসের সন্ধি হইতে বার্লিন সন্ধি পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ ১৮৫৬—৭৮ : প্যারিসের সন্ধিতে যোগদানকারী শক্তিবর্গ উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার আসিয়াছিল তাহার প্রভাব তুরস্কের অধীন জাতিগুলির উপর পড়িয়াছিল। ইহা রুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। শক্তিবর্গের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন আরম্ভ হইল।

প্যারিসের সন্ধি দ্বারা তুরস্কের সুলতানের অধীনে ওয়ালাচিয়া ও মোলডাভিয়াকে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃঃ দুইটি রাজ্য একত্রিত হইয়া রুমানিয়া রাজ্য গঠন করিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এই পরিবর্তন স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ১৮৬৭ খৃঃ ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার চেষ্টায় সার্বিয়া হইতে তুর্কী সৈন্য প্রত্যাহার করা হইল। রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৮৬৫ খৃঃ ক্রীটে এবং ১৮৭০ খৃঃ বুলগারদের বিদ্রোহে উৎসাহ প্রদান করিল। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া সিবাষ্টোপোল সুরক্ষিত করিল এবং কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত করিল। ইংল্যাণ্ডের প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল। অতঃপর রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

রাশিয়া—তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮) : বলকান সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া রাশিয়ার সহিত তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং গ্রীকদের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে বলকান উপত্যকার অন্যান্য জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সর্ব-শ্লাভ (Pan-slavism) আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক শ্লাভ অধিবাসী ছিল। রাশিয়া এই সর্ব শ্লাভীয় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল। সার্বিয়া চাহিতেছিল তাহার নেতৃত্বে সমস্ত শ্লাভ এবং ক্রোটদের অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া একটি রাজ্য গঠন করিতে। এদিকে তুরস্কের সুলতান বলকান অঞ্চলে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংস্কার প্রবর্তন করেন নাই। বরং জনসাধারণ করভারে জর্জরিত হইতেছিল।

কারণ

১৮৭৫ খৃঃ বসনিয়া এবং হারজিগোভিনার কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রো এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। বৃহৎ শক্তিগুলি এই বিদ্রোহের গুরুতর পরিণতি এড়াইবার জন্য সুলতানের নিকট এক বার্তা প্রেরণ করিয়া বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের দাবি করিলেন (Andrassy Note)। সুলতান সংস্কার প্রবর্তনের মৌখিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তুর্কী সৈন্যদল নির্মমভাবে বুলগেরিয়ার বিদ্রোহ দমন করিল। তুর্কী সৈন্যদলের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র ইউরোপে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া গেল। গ্লাডষ্টোন ঘোষণা করিলেন তুরস্ককে বলকান হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী তুরস্কের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে চাহেন নাই। ফলে রাশিয়া এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল।

সান ষ্টিফানোর সন্ধি

দানিয়ুব অতিক্রম করিয়া, রুশবাহিনী প্লেভ্‌না'র যুদ্ধে তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল অভিমুখে অগ্রসর হইল। পরাজিত সুলতান সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। সানষ্টিফানোর সন্ধির দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী সুলতান সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন ও বসনিয়া এবং হারজিগোভিনায় সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। রাশিয়া বাটুম, খার্স এবং বেসারাভিয়া পাইল; সুলতান রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং রুমানিয়াকে দোবরুজা অঞ্চল প্রদান করিলেন। ইহা ব্যতীত 'বৃহৎ বুলগেরিয়া' রাজ্য গঠন করা হইল। 'বৃহৎ বুলগেরিয়া' প্রায় স্বাধীন রাজ্য হইল। সানষ্টিফানোর সন্ধি রাশিয়ার বিরাট সাফল্যের পরিচয়। তুর্কী সাম্রাজ্য প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় ইংলণ্ড আতংকিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড সানষ্টিফানোর সন্ধির সর্তাবলী পুনরায় আলোচনার দাবী জানাইল। অষ্ট্রিয়াও ইংলণ্ডের দাবী সমর্থন করিল। বাধ্য হইয়া রাশিয়া তুরস্কের সমস্যা ইউরোপীয় সম্মেলনে আলোচনা করিতে সম্মত হইল। ১৮৭৮খৃঃ বিসমার্কের সভাপতিত্বে বার্লিনে এই সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হইল। এই সম্মেলনে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল তাহাই বার্লিনের সন্ধি নামে খ্যাত। ইহার সর্ত অনুযায়ী (১) মণ্টেনিগ্রো, রুমানিয়া এবং সার্বিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল; (২) বৃহৎ বুলগোরিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হইল; কিন্তু একটি অংশ তুরস্কের অধীন করদ রাজ্য হইল, অপরটির উপর তুরস্কের সার্বভৌম অধিকার মাত্র বজায় রহিল; (৩) রাশিয়া বেসারাভিয়া এবং এশিয়া মাইনরে কয়েকটি অঞ্চল পাইল; (৪) বসনিয়া এবং হারজিগোভিনা তুরস্কের অধীন রহিল, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার হস্তে ইহার শাসনভার অর্পণ করা হইল; (৫) তুরস্কের সহিত এক পৃথক চুক্তি করিয়া ইংলণ্ড সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করিল।

সমালোচনা

কিন্তু এই সন্ধি বিভিন্ন দিক হইতে নিন্দা করা হইয়াছে। সার্বিয়া, রুমানিয়া এবং মণ্টোনিগ্রোকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইলেও এই সন্ধি বলকান জাতিগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। বসনিয়া এবং হারজিগোভিনাকে অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীন করা হইয়াছিল অথচ ইহারা সার্বিয়ার সহিত যুক্ত হইতে চাহিয়াছিল। বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করার ফলে বুলগেরিয়ার অধিবাসীগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্য বার্লিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যে শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্য বজায় রাখিবার পক্ষপাতী ছিল তাহারাই বার্লিন সম্মেলনে তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চল আত্মস্মাৎ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করা। কিন্তু ইউরোপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রাশিয়া মধ্যএশিয়ার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভারত সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডিজরেলী ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনি 'সম্মানের সহিত শান্তি' (peace with honour) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই সন্ধি সম্মানজনক হয় নাই। তুরস্কের বিপদের সুযোগে তাহার নিকট হইতে সাইপ্রাস, বসনিয়া এবং হারজিগোভিনা কাড়িয়া লওয়া দস্যুবৃত্তির সামিল। বলকান অঞ্চল বিক্ষোভের বারুদস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। এই বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ হইতে ১৯১২ খৃঃ এবং ১৯১৩ খৃঃ বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৮১৫ ওয়টারলুর যুদ্ধ ; ভিয়েনা সম্মেলন ; পবিত্র মৈত্রী ; চতুঃশক্তি মৈত্রী।
১৮১৯ চার্লসবাড ঘোষণা।
১৮২০ ট্রপো সম্মেলন।
১৮২১ গ্রীক বিদ্রোহ।
১৮২৭ নাভারিনোর যুদ্ধ।
১৮২৯ আড্রিয়ানোপলের সন্ধি।
১৮৩০ জুলাই বিপ্লব ; ফ্রান্স—বেলজিয়াম ও পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ।
১৮৩২ গ্রীসের স্বাধীনতা।
১৮৩৩ আনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি।
১৮৪১ লণ্ডনের সন্ধি।
১৮৪৮ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, ফ্রান্স ; জার্মানী, ইটালী ও অস্ট্রিয়ায় বিদ্রোহ, লুই-ফিলিপির পতন, ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ; রাষ্ট্রপতি পদে লুই নেপোলিয়ন, ফ্রাংকফুর্ট-পার্লামেণ্ট।
১৮৫১ দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পতন ; সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।
১৮৫৪-৫৬ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।
১৮৫৬ প্যারিসের সন্ধি।
১৮৫৯ ইটালীর মুক্তিসংগ্রাম ; ভিলাফ্রাংকার সন্ধি।
১৮৬০ গ্যারিবল্ডী ও সহস্রের অভিযান।
১৮৬২ প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে বিসমার্ক।
১৮৬৪ শ্লেসুইগ-হলেষ্টিনের যুদ্ধ।
১৮৬৬ অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুদ্ধ ; স্যাডোয়া।
১৮৭০ ফ্রাংকো-প্রাশিয়া যুদ্ধ।
১৮৭১ জার্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৭ রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধ।
১৮৭৮ সান ষ্টিফানোর সন্ধি ; বার্লিনের সন্ধি।

প্রশ্নাবলী

1. Describe and criticise the political settlement effected by the Congress of Vienna.

ভিয়েনা সম্মেলন কর্তৃক ইউরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের বিবরণ দাও এবং সমালোচনা কর।

2. Give an account of the activities of the Concert of Europe.
   ইউরোপের কনসার্টের কার্যাবলী আলোচনা কর।

3. Write what you know about Metternich and his policy.
   মেটারনিখ ও তাহার নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

4. Estimate the causes and importance of the July Revolution of 1830.
   ১৮৩০ খৃঃ জুলাই বিপ্লবের কারণগুলি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

5. Give of short account of the, causes, extent and importance of the Revolution of 1848 in France.
   ১৮৪৮ খৃঃ ফ্রান্সের বিপ্লবের কারণ, বিস্তৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

6. Briefly describe the Career of Napoleon III.
   তৃতীয় নেপোলিয়নের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

7. Trace the history of the unification of Italy and access the contributions of Mazzini, Garibaldi and Cavour.
   ইটালীর ঐক্যের ইতিহাস ও ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুরের অবদান আলোচনা কর।

8. Give a brief history of the unification of Germany.
   জার্মানীর ঐক্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

9. Describe the foreign policy of Bismark.
   বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর।

10. Trace the origin and main phases of the Eastern question upto the Treaty of Berlin 1878.
   ১৮৭৮ খৃঃ বার্লিনের সন্ধি পর্যন্ত প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি আলোচনা কর।

11. Narrate the causes and result of the Crimean war.
   ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবঃ ফরাসী বিপ্লবের আঘাতে এবং নেপোলিয়নের আবির্ভাবের ফলে যখন ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তখন ফ্রান্সের প্রধান শত্রু ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যে আমূল রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে এই আমূল পরিবর্তন শিল্পবিপ্লব নামে খ্যাত।

১৭৬০ খৃঃ তৃতীয় জর্জের সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হইতে থাকে। অবশ্য তাহার পূর্বেই শিল্প বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। পূর্বে বিভিন্ন জিনিসপত্র কারিগরগণ হাতে প্রস্তুত করিত এবং গৃহের সহিত সংলগ্ন দোকানে সেই সকল জিনিসপত্র বিক্রয় হইত। এই সকল কুটীর শিল্পে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্যই পণ্য প্রস্তুত হইত। কারণ যানবাহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য উৎপন্ন জিনিষ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় ষোড়শ শতকে আরম্ভ হইল উপনিবেশ বিস্তার এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার। ক্ষুদ্র শিল্পের উপর অসম্ভব চাপ পড়িল। দেশ-বিদেশে রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপন্ন করিতে হইত। এই পণ্য দেশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া ইউরোপীয় বণিকগণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু প্রাচ্যের বাজারে ইউরোপের উৎপন্ন পণ্য রপ্তানি হইবার ফলে জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল এবং অধিক পরিমান পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হইল। কল কারখানা স্থাপিত হইল। অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে প্রচুর পণ্য উৎপাদন হইতে লাগিল। কারিগরদের ক্ষুদ্র শিল্প বিনষ্ট হইল তাহারা কলকারখানার মালিকদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিল।

শিল্প বিপ্লবের পটভূমি

ষ্টীম ইঞ্জিন আবিস্কৃত হইবার ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। প্রথমেই ইংলণ্ডে বস্ত্র শিল্পের রূপান্তর ঘটিল। বস্ত্র প্রস্তুতের দুইটি পদ্ধতি। প্রথমতঃ তূলা হইতে সূতা কাটা এবং দ্বিতীয়তঃ সূতা দিয়া কাপড় বোনা। ইহাতে তাঁতিদের কাপড় বুনিতে যথেষ্ট সময় লাগিত। কিন্তু ১৭৩৩ খৃঃ জন কে নামক এক ব্যক্তি উড়ন্ত মাকু (Flying Shuttle) আবিস্কার করেন। ইহাতে কাপড় বোনা অনেক সহজ হইল। ১৭৬৭ খৃঃ জেমস্ হারগ্রীভস্ একপ্রকার যন্ত্র আবিস্কার করেন (Spinning Jenny) যাহার ফলে দ্রুত সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন সম্ভব হইল। ১৭৬৯ খৃঃ রিচার্ড আর্করাইট জল শক্তির সাহায্যে চালিত একটি যন্ত্র আবিস্কার করেন যাহার ফলে বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইল। ইহার পর ডাঃ এডমাণ্ড কার্টরাইট জল শক্তি চালিত স্বয়ং ক্রিয় একপ্রকার যন্ত্র আবিস্কার করেন, ইহাতে দ্রুত বস্ত্র বয়ন সম্ভব হইল। অতঃপর জেমস্ ওয়াট যখন বাষ্প চালিত ইঞ্জিন আবিস্কার করিলেন তখন বস্ত্র শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইল। ইংলণ্ডে একাধিক কাপড়ের কল স্থাপিত হইল। ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হইল।

হস্তচালিত তাঁত

বস্ত্র শিল্প

শিল্পোন্নয়নের জন্য লোহা এবং কয়লা প্রয়োজন ; বাষ্পের জন্য কয়লা প্রয়োজন, ইস্পাতের জন্য লোহা প্রয়োজন। পূর্বে কাঠকয়লার দ্বারা লোহা গলাইতে হইত। কিন্তু কয়লা খনি আবিস্কৃত হইবার ফলে লৌহ গলাইয়া ইস্পাত তৈয়ারী করা সম্ভব হইল। কয়লা খনি অঞ্চলে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু খনি হইতে কয়লা উঠানো এবং লৌহ কারখানায় প্রেরণের অসুবিধা দেখা দিল ষ্টীম ইঞ্জিন বা বাষ্পযান আবিস্কৃত হইবার ফলে সেই সমস্যা আর রহিল না।

কয়লা ও ইস্পাত শিল্প

ইস্পাত শিল্পে ইংলণ্ডের অভাবনীয় উন্নতি হইল। প্রাকৃতিক শক্তি কাজে লাগাইয়া ইংলণ্ড ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের উন্নতির প্রয়োজন দেখা দিল। পূর্বে যানবাহনের অসুবিধার জন্য দেশ বিদেশে জিনিষ পত্র রপ্তানি করা সম্ভব হইত না। কিন্তু ক্রমে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পাকা রাস্তা তৈয়ারী হইল। জন ম্যাকাদাম পিচ ও পাথর কুচি দিয়া রাস্তা তৈয়ারী করিবার পদ্ধতি বাহির করেন। পূর্বে পালতোলা এবং দাঁড় চালিত জাহাজ নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত। কিন্তু ইহাতে কাঁচামাল আমদানী ও প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি অসম্ভব হইয়া পড়িল। দ্রুতগামী জলযানের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ১৮০৭ খৃঃ ফুলটনের বাষ্পচালিত নৌকা নিউ ইয়র্ক হইতে মাত্র বত্রিশ ঘণ্টায় একশত পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করিয়া আলবেনীতে পৌছিল। ক্রমশঃ বাষ্প চালিত ষ্টীমার ও জাহাজ প্রচলিত হইল। ১৮৩৮ খৃঃ বাষ্প চালিত জাহাজ আণ্টলাণ্টিক পাড়ি দিল। মাত্র পনেরো দিনে ব্রিষ্টল হইতে নিউইয়র্কে পৌছান সম্ভব হইল। দ্রুতগামী বাষ্পচালিত জাহাজ ও ষ্টীমার সমুদ্রপথে যাতায়াতের যুগান্তর সৃষ্টি করিল।

যানবাহন

স্থলপথে যাতায়াতের জন্য রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইল। বাষ্পের সাহায্যে রেল চালাইবার ব্যবস্থা হইল। ১৮১৩ খৃঃ উইলিয়াম হেড্‌লি 'পোফিংবিলি' নামক একধরণের রেল ইঞ্জিন তৈয়ারী করেন কিন্তু ইহাতে অনেক অসুবিধা ছিল। ১৮১৪ খৃঃ জর্জ ষ্টিফেনসন তাহার প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈয়ারী করেন। ইহা খুব দ্রুত চলাচলের পক্ষে উপযোগী ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ইহার সংস্কার করিয়া নূতন এবং উন্নত ধরণের ইঞ্জিন তৈয়ারী করিলেন। ফলে ১৮৩০ খৃঃ ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলিবার
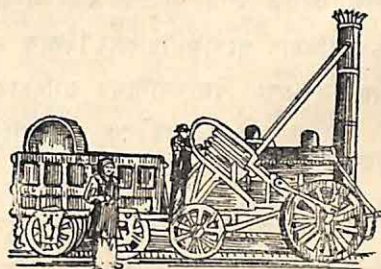
স্টিফেনসনের রেলইঞ্জিন

রেল ইঞ্জিন

উপযোগী রেলগাড়ী তৈয়ারী হইল। ইংলণ্ডের সর্বত্র রেলপথ নির্মিত হইল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিদ্যুৎ শক্তি চালু হইল। বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা আরও সহজে যন্ত্র এবং গাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা হইল। বৈদ্যুতিক পাখা, বিজলী বাতি কত কি না আবিস্কৃত হইল। কৃষিরও উন্নতি হইল। পতিত জমি চাষ আবাদ করিবার এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ও পশুপালনের ব্যবস্থা হইল। ট্রাক্টর প্রভৃতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষআবাদ করিবার ফলে জমি ধনিক শ্রেণীর হস্তগত হইল। গরীব চাষীগণ বেকার হইয়া পড়িল। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন দেশ কল কারখানায় ছাইয়া গেল। কুটীর শিল্প বিনষ্ট হইল। যন্ত্রপাতি আবিস্কার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি, যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প সম্ভার উৎপাদন এবং দ্রুতগামী যানবাহন আবিস্কৃত হইবার ফলে মানুষের জীবন উন্নত এবং সুন্দর হইল। পূর্বে যাহা কেবলমাত্র ধনিক শ্রেণী ভোগ করিত তাহা সংগ্রহ করা সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব হইল। প্রচুর পরিমাণ প্রয়োজনীয় এবং বিলাস সামগ্রী উৎপন্ন হইবার ফলে মানুষের প্রয়োজন এবং বিলাসব্যসনের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইল। পুরাকালে মানুষ প্রকৃতিকে ভয় পাইত। প্রাকৃতিক্ শক্তিকে অপদেবতা বা দেবতা মনে করিয়া পূজা করিত। সেই প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করিয়া মানুষ সভ্যতার মোড় ঘুরাইয়া দিল। মানুষের আর নিত্য প্রয়োজনীয় বা বিলাস সামগ্রীর অভাব রহিল না। কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল সহর, আধুনিক সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সুবিধা

শিল্প বিপ্লব শুধু মানুষের জীবনে আশীর্বাদ লইয়া আসে নাই অভিশাপও আনিয়াছে। শিল্প কুটীর হইতে কারখানায় স্থানান্তরিত হইবার ফলে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। ধনিক এবং শ্রমিক এই দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব হইল।

যন্ত্রপাতি বসাইয়া বড় বড় কলকারখানা স্থাপনের ক্ষমতা একমাত্র ধনিক শ্রেণীর ছিল। সুতরাং ধনিকদের কলকারখানায় গরীব জনসাধারণ জীবিকা অর্জনের জন্য চাকুরী গ্রহণ করিল।

অসুবিধা

উভয়ের মধ্যে নূতন সম্পর্ক নিরূপনের প্রশ্ন দেখা দিল। কারণ কর্মচারী হইল মালিকের বেতনভুক্ত কর্মচারী। শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফলে যে পণ্য উৎপন্ন হইত তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করিয়া মালিক বিরাট ধনী হইল। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, কাজের সময়, বেতন, স্বাস্থ্য, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া মালিকের সহিত শ্রমিকের বিরোধ আরম্ভ হইল। শ্রমিকদের প্রত্যেকের স্বার্থ অভিন্ন হওয়ায় তাহারা মালিকের জুলুম এবং হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইল। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। কাজের সময় নির্দ্ধারিত হইল। কারখানায় নিযুক্ত হইবার ন্যূনতম বয়স নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই। শ্রমিক মালিক সংঘাত চলিতেছে। শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য হইতে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শে একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। শ্রমিক মালিকের বিরোধের ফলে বিভিন্ন দেশে শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইতেছে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হইল। ফলে অধিক কাঁচা মালের প্রয়োজন হইল এবং উৎপন্ন পণ্যের জন্য নূতন বাজারের প্রয়োজন হইল। ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। প্রাচ্যের বাজার ইউরোপী বণিকদের হস্তগত হইল। এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তিগুলি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব

ইউরোপীয় বণিকদল ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। ক্রমে ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য জাতিগুলি হটিয়া গেল। কোম্পানি ভারতের নৃপতিদের পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। ১৮৫৮ খৃঃ কোম্পানীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডের সরকার ভারতের শাসনভার হস্তগত করিল। ভারতের কাঁচামাল লুণ্ঠন

করিয়া এবং ভারতে পণ্য বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড সমৃদ্ধশালী হইল। ভারতে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। সহর ও বন্দর গড়িয়া উঠিল। রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু ভারতের কুটীর শিল্প ধ্বংস হইল। শিল্প বিপ্লবের ফলাফল ভারতের পক্ষে অভিশাপ এবং আশীর্বাদ দুইই।

প্রশ্নাবলী

1. What is Industrial Revolution? Write what you know about Industrial Revolution in England.

শিল্প বিপ্লব কি? ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

2. What were the effects of Industrial Revolution? How it affected India?

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল কি হইয়াছিল? ইহা ভারতকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল?

পঞ্চম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৮৭৮-১৯১৪)

ইউরোপের অবস্থা ঃ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত সময়কালকে অস্ত্রসজ্জার যুগ বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে ১৯০৫ খৃঃ রুশ জাপান যুদ্ধ এবং ১৯১২ ও ১৯১৩ খৃঃ বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতা অর্জনের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র বিন্যাস স্থায়ী হইয়াছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। শিল্প বিপ্লব শুধু ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফ্রান্স, জার্মাণী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অজস্র কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শিল্প বিপ্লবের বিস্তার

ট্রেন, মোটরগাড়ী, সাইকেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। পেট্রোলের ব্যবহার আরম্ভ হইল। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরোধের ফলে শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হইল—শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইল। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণী বহু সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হইল। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে কারখানা আইন এবং অন্যান্য আইন প্রবর্তিত হইল। সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ফলে মানুষের চিন্তা জগতেও পরিবর্তন সাধিত হইল। ফলে জন্ম হইল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের জন্ম-দাতাদের মধ্যে কার্ল মার্কেসের নাম স্মরণীয়। অবশ্য মার্কস এর পূর্বে রবার্ট, ওয়েন, হডস্‌কিন, উইলিয়াম থম্পসন, ফুরিয়ার, সেণ্ট সাইমন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। মার্কস সমাজতন্ত্রী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক রূপদান করিলেন। এযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল নারী প্রগতি। নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন হয়, যাহার ফলে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের বহু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইল।

শ্রমিক আন্দোলন ; সমাজতন্ত্র

এই যুগকে (১৮৭৮-১৯১৪) অস্ত্রসজ্জার যুগও বলা যায়। ১৮৭০ খৃঃ প্রাশিয়ার হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ফ্রান্সের সামরিকবাহিনী পুনর্গঠিত করা হইল। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইল। ফলে জার্মাণীর সহিত ফ্রান্সের অস্ত্র সজ্জার বা সামরিকশক্তির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল।

বৃহৎ শক্তিগুলির অস্ত্রসজ্জা

উভয়ে উভয়ের অস্ত্র সজ্জায় শংকিত হইয়া ক্রমাগত সামরিক শক্তি বাড়াইতে লাগিল। বস্তুতঃপক্ষে ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সকল বৃহৎ শক্তি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তন করিল।

১৮৭১-৯০ পর্যন্ত বিসমার্ক ছিলেন ঐক্যবদ্ধ জার্মাণীর চ্যান্সেলার। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মাণী বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সম্রাট থাকিলেও বস্তুতঃ পক্ষে বিসমার্ক ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি

জার্মাণী

শক্তিশালী রোমান ক্যাথলিক এবং সমাজতন্ত্রীদের শক্তি চূর্ণ করেন। ১৮৮৮ খৃঃ বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইল তাহার পুত্র তৃতীয় ফেডারিক সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু চারিমাসের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম জার্মাণীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের স্রষ্ঠা চ্যান্সেলার বিসমার্কের সহিত উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক তরুন সম্রাটের মধ্যে তীব্র বিরোধ আরম্ভ হইল। কাইজার উইলিয়াম বিসমার্কের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ বিসমার্ক পদত্যাগ করিয়া মৃত সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের সমাধির উপর একটি গোলাপ ফুল অর্পণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যবর্তন করিলেন। বিসমার্ক চিরদিনের জন্য রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

সিডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইবার ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতন হইয়াছিল এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃঃ

ফ্রান্স

সমাজতন্ত্রীদের 'কমিউন' প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকার সমাজতন্ত্রীদের উপর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খৃঃ নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিয়া ফ্রান্সে

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পোন্নয়নের ফলে ফ্রান্সে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্ভব হয়। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯০৬ হইতে ১৯১০ খৃঃ পর্যন্ত ফ্রান্সে একাধিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৮১ খৃঃ আততায়ীর হস্তে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহত হইলে তাহার পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৮১-১৮৯৪) এবং তাহার পর দ্বিতীয় নিকোলাসের (১৮৯৪-১৯১৭) প্রতিক্রিয়াশীল এবং নির্মম শাসনে রাশিয়ায় শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। জারের শাসনের অবসানের জন্য বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। জার নিকোলাসকে বারংবার হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৯০৫ খৃঃ রাশিয়া জাপানের হস্তে পরাজিত হইল। ইহার পর হইতে জার শাসিত রাশিয়া এক ভয়াবহ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাশিয়া

এদিকে ঐক্যবদ্ধ ইটালী আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। আফ্রিকায় ইটালী উপনিবেশ স্থাপন করিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ জার্মাণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর বিসমার্কের নীতি ছিল জার্মান সাম্রাজ্য দৃঢ় এবং শক্তিশালী করিবার জন্য ইউরোপে শান্তি বজায় রাখা। ১৮৭২ খৃঃ বিসমার্কের চেষ্টায় অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়ার সম্রাটদের এক সংঘ গঠিত হয় (Dreikaiser-bund)। কিন্তু ১৮৭৮ খৃঃ বার্লিন সন্ধিতে বিসমার্কের রুশ বিরোধী নীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার 'ড্রেকাইজারবাণ্ড' পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী সুদৃঢ় করেন (Dual Alliance) এবং ১৮৮২ খৃঃ জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া এবং ইটালীকে লইয়া ত্রিশক্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেন (Triple Alliance)। রাশিয়ার সহিত মৈত্রী বিনষ্ট হইলেও বিসমার্ক রাশিয়ার সহিত এক গোপন চুক্তি করিয়া জার্মাণী আক্রান্ত হইলে রাশিয়ার নিরপেক্ষতা আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু ১৮৯০ খৃঃ বিসমার্কের পতনের পর হইতে ১৯১৪ খৃঃ

ত্রিশক্তি-মৈত্রী

পর্যন্ত জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়াম পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন। কাইজার উইলিয়াম ছিলেন বয়সে তরুন এবং উচ্চাভিলাষী। তাহার মধ্যে দূরদৃষ্টি এবং কূটনৈতিক জ্ঞানের অভাব ছিল। অদম্য উৎসাহ এবং আকাংখা লইয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিসমার্কের সতর্ক নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং জার্মাণীকে বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য ইউরোপ ও ইউরোপের বাহিরে উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। উপনিবেশ রক্ষার জন্য এবং ইংলণ্ডের সহিত পাল্লা দিবার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিলেন। কাইজারের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বরাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, উপনিবেশ বিস্তার এবং নৌবাহিনী গঠন। কাইজারের কার্যকলাপে ভীত ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বি-শক্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল (Dual Alliance)। ফ্রান্স এবং রাশিয়া অপেক্ষা জার্মাণীর সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। কিন্তু চীন ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার লইয়া জার্মাণী এবং রাশিয়ার সহিত ও ফ্যাসোডা ঘটনা লইয়া ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয়। ইংলণ্ড মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ১৮৯০-১৯০১ খৃঃ জোসেফ চেম্বারলেনএর ইংলণ্ড, জার্মাণী ও আমেরিকার মধ্যে মৈত্রী প্রস্তাব ব্যর্থ হয়। কাইজার যখন বার্লিন—বাগদাদ রেলপথ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন তখন জার্মানীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংলণ্ড সন্দিহান হইল। তদুপরি ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যে কাইজার যখন দ্রুত নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন তখন ইংলণ্ড প্রমাদ গণিল। ১৯০৪ খৃঃ ইঙ্গ-ফরাসী সম্মেলনে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করা হইল। মিশরে ইংরেজ আধিপত্য এবং মরোক্কোয় ফরাসী আধিপত্য স্বীকৃত হইল। ১৯০৫ খৃঃ রুশ জাপান যুদ্ধ, ১৯০৫-৬ খৃঃ মরোক্কোয় ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে জার্মাণীর হস্তক্ষেপ এবং ১৯০৬ খৃঃ নৌশক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্মাণীর প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৭ খৃঃ ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী স্থাপিত হইল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল। জার্মাণীর উগ্র কার্যকলাপের ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইটালী, সংঘবদ্ধ হইল।

দ্বিশক্তি মৈত্রী

একমাত্র অষ্ট্রিয়া জার্মাণীর মিত্র রহিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি বিপজ্জনক ভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। তথাপি ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত ইংলণ্ড জার্মাণীর সহিত বিরোধ মীমাংসা করিয়া মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহা ব্যর্থ হইল। দুইটি শত্রু শিবিরে বিভক্ত ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ হইল। বিশ্ব-পরিস্থিতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করিল। ইউরোপ বারুদ স্তূপে পরিণত হইল। মরোক্কোর বন্দর আগাদির'এ জার্মাণ যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণকে কেন্দ্র করিয়া ফ্রান্স ও জার্মাণীর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে ইহার মীমাংসা হইল। ১৯১৩ খৃঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র সজ্জা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইল। এদিকে ১৯১২-১৩ খৃঃ বলকান যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব ইউরোপে অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হইল। ১৯১৪ খৃঃ অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড সেরাজেভোতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে চরম পত্র প্রেরণ করিল। কিন্তু সার্বিয়ার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালীর মৈত্রী

বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ

সাম্রাজ্যবাদ : উপনিবেশ বিস্তার : উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট হইতেছে ইউরোপের শক্তিগুলি কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। 'অন্ধকার আফ্রিকা'কে ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। এশিয়ার দুর্বল রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের শক্তিবর্গ গ্রাস করিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে অজস্র কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। পণ্য উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইউরোপীয় জাতিগুলি কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এবং উৎপন্ন পণ্যের বাজারের সন্ধানে উপনিবেশ বিস্তার এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইল। অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের জন্য এবং বর্ধিত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। ইউরোপে জঙ্গীবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইল। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা যেন প্রতিটি রাষ্ট্রের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিত। সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য

উপনিবেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই কারণগুলি ব্যতীত খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারিগণ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে গমন করিতে লাগিল। ইহারা উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হইয়াছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য জাতিগুলি এশিয়া এবং আফ্রিকাকে শোষণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

এশিয়া ঃ পূর্ব হইতেই ভৌগলিক আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিগুলি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পুনরায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইল। ইউরোপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রাশিয়া ধীরে ধীরে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮৭৮ খৃঃ মধ্যে রাশিয়া আফগান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র মধ্যএশিয়া অধিকার করিয়া লইল এবং ১৮৮১ খৃঃ তুর্কীস্থান ও ১৮৮৪ খৃঃ মার্ভ গ্রাস করিল। আফগান সীমান্তে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংলণ্ড আতংকিত হইল। কারণ ইহার ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। ১৯০৭ খৃঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রর মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয়। ১৮৫৮ খৃঃ রাশিয়া দুর্বল চীনকে আইগুনের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলে রাশিয়া আমুর নদী অঞ্চলে বিস্তৃত ভুখণ্ড লাভ করিল। ইহার পরই রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আরও অঞ্চল অধিকার করিল এবং ব্লাডিভষ্টকে এক নৌঘাঁটি নির্মাণ করিল। ইউরোপে বাল্টিক সাগর হইতে পূর্বে জাপান সাগর পর্যন্ত ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর বিশাল রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ইহার ফলে তাহাকে জাপানের সহিত সংঘর্ষে উপনীত হইতে হইল। শুধু রাশিয়া ও জাপান নহে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ খুশীমত চীনের এক এক অংশ গ্রাস করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নির্মমভাবে চীনকে শোষণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম এবং মালয় জুড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্স ইন্দোচীন গ্রাস করিল। ওলন্দাজরা আসিয়া ইন্দোনেশিয়া অধিকার করিল। ১৮৯৮ খৃঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন

অধিকার করিল। মধ্য প্রাচ্যে সিরিয়ায় ফরাসী আধিপত্য বিস্তৃত হইল। পারস্যের এক অংশে ইংলণ্ড এবং অন্য অংশে রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইল। তুরস্ক লইয়া শক্তিবর্গের সংঘাতের মধ্যে জার্মানীও আবির্ভূত হইল। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি জাপান, জার্মানী, ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল।

আফ্রিকা : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত আফ্রিকা ইউরোপের জাতিগুলির নিকট 'অন্ধকার মহাদেশ' বলিয়া পরিচিত ছিল। সমুদ্র উপকূলে কয়েকটী ইউরোপীয় ঘাঁটি ছিল সত্য কিন্তু আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগের সহিত ইউরোপীয়দের কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়নের মিশর বিজয় এবং তাহার পর মিশর হইতে ফরাসীদের বিতাড়নের ফলে ইউরোপের জাতিগুলির দৃষ্টি আফ্রিকার প্রতি নিবদ্ধ হইল। ডেভিড লিভিংস্টোন, ষ্ট্যান্‌লী প্রভৃতি দুঃসাহসিক পর্যটকেরা আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অজানা মহাদেশের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। মন্‌রো নীতির ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ বিস্তারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য শক্তিগুলি আফ্রিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইল। পুরানো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহিত ইটালী ও জার্মানী আফ্রিকা লুণ্ঠনে অগ্রসর হইল।

ফ্রান্স

ফ্রান্স প্রথমে আলজিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিল। ১৮৮২ খৃঃ টিউনিস ফ্রান্সের হস্তগত হইল। ক্রমে, মরক্কো, সমগ্র সাহারা অঞ্চল, মাদাগাস্কার, কঙ্গো, সোমালিল্যাণ্ড, এবং আরও কয়েকটি অঞ্চল ফ্রান্স গ্রাস করিল। ইংলণ্ড মিশর ও সুদান অধিকার করিল। নীলনদ ও সুয়েজ অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তৃত হইল। অতঃপর উগাণ্ডা ও ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকায় ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলণ্ড ট্রান্সভাল, ন্যাটাল, অরেঞ্জ রিভার কলোনী, কেপ কলোনী, রোডেশিয়া এবং বেচুয়ানাল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল। ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশগুলির মধ্যে গাম্বিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, গোল্ডকোষ্ট ও নাইজেরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। মিশরের খেদিভের নিকট হইতে সুয়েজ খালের শেয়ার ক্রয় করিয়া ডিজরেলী সুয়েজ

ইংলণ্ড

খালের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। বেলজিয়াম সমৃদ্ধ রবারের দেশ কঙ্গো হস্তগত করিল। ইটালী সোমালিল্যাণ্ড, এরিত্রিয়া, ত্রিপলি এবং সাইরেনেশিয়া অধিকার করিল। পর্তুগাল পূর্ব আফ্রিকা এবং এঞ্জেলোয় উপনিবেশ স্থাপন করিল। স্পেনও একাধিক উপনিবেশ স্থাপন করিল। সর্বশেষে আসিল জার্মানী। আফ্রিকায় একাধিক জার্মান উপনিবেশ স্থাপিত হইল। ১৮৮৪ খৃঃ জার্মানী

বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন ও জার্মানী
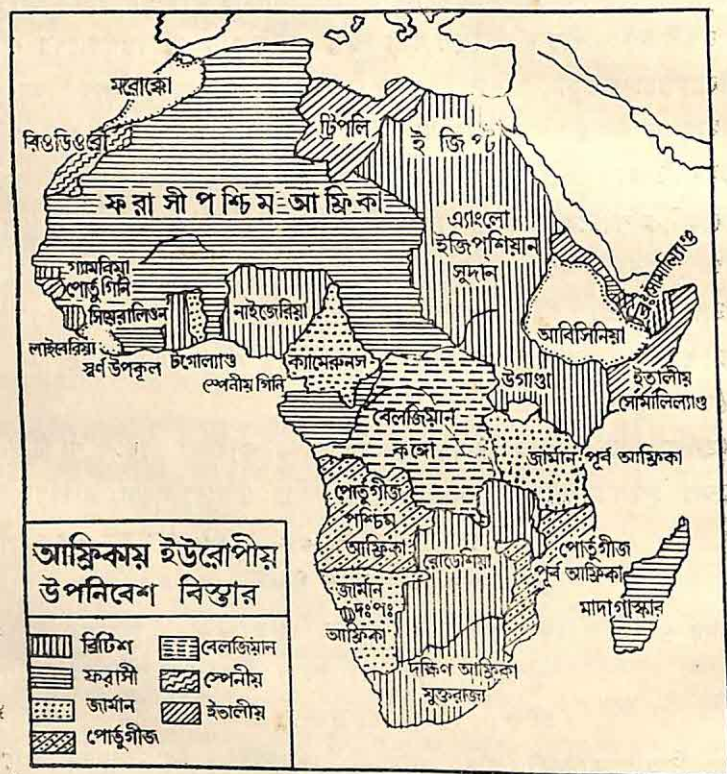
জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা নামে একটি বিরাট উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিল। অতঃপর জার্মান পশ্চিম আফ্রিকা, টোগোল্যাণ্ড এবং ক্যামেরুনে জার্মানীর উপনিবেশ স্থাপিত হইল। ১৯১৪ খৃঃ মধ্যে আবিসিনিয়া

এবং লাইবেরিয়া ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকা ইউরোপীয় জাতিগুলি ভাগ করিয়া লইল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণাম : সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মধ্যে আরম্ভ হইল তীব্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একদিন ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পৃথিবী ধীরে ধীরে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনার পথে অগ্রসর হইল।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৮৭৮ বার্লিনের সন্ধি।
১৮৭৯ দ্বি-শক্তি মৈত্রী।
১৮৮২ ত্রি-শক্তি মৈত্রী।
১৮৯০ বিসমার্কের পতন।
১৮৯৪ ফ্রান্স ও রাশিয়া মৈত্রী।
১৮৯৪-৯৫ চীন-জাপান যুদ্ধ।
১৯০৪-৫ রুশ-জাপান যুদ্ধ।
১৯০৫-৬ মরোক্কো সমস্যা।
১৯০৭ ইঙ্গ-রুশ চুক্তি।
১৯১১ আগাদির ঘটনা।
১৯১২-১৩ বলকান যুদ্ধ।
১৯১৪ অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
১৮৭৬-১৯১৪ আফ্রিকা বিভাগ।

প্রশ্নাবলী

1. **Briefly** describe the condition of Europe and International Relations from 1878 to 1914.

১৮৭৮ খৃঃ হইতে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত ইউরোপের অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Write what you know about the expansion of Europe in Asia and Africa.

এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

3. Briefly describe the partition of Africa by European powers.

ইউরোপীয় জাতিগুলি কর্তৃক আফ্রিকা বিভাগ বর্ণনা কর।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (স্বাধীনতা হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত)

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন ১৭৮৭ খৃঃ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ১৭৮৩ খৃঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলে উপনিবেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তদুপরি উপনিবেশগুলির কেন্দ্রীয় শাসনভার ছিল সকল উপনিবেশের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কংগ্রেসের উপর। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল খুব সামান্য। উপনিবেশগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত থাকিলেও উপনিবেশগুলির মধ্যে পৃথক ক্ষমতা বজায় রাখিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে। সকল উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিপজ্জনক অবস্থার অবসান করিবার জন্য ১৭৮৭ খৃঃ ফিলাডেলফিয়া শহরে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের জন্য এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হয়। ইহার ফলে ১৭৮৮ খৃঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা দুই কক্ষ বিশিষ্ট কংগ্রেস, রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। কংগ্রেসের উপর যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আইন প্রনয়ণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি চারিবৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি কংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবেন না। তিনি নামেমাত্র রাষ্ট্রপতি নহেন—প্রভুত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চে রহিল সুপ্রীম কোর্ট। এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার ফলে উপনিবেশগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৮৯-৯৭ঃ নূতন সংবিধান অনুযায়ী জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নেতা। সুতরাং জাতি এই জনপ্রিয় নেতাকে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়াছিল। তিনি ছিলেন "first in peace first in war, and first in the hearts of his countrymen". তাহার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র সংকটমুক্ত হইয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। জাতিগঠনের কার্যে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি ভবিষ্যতের শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ("Independence and union alike rested upon him, making him in no sense of mere encomium, the father of his country") হ্যামিলটন এবং জেফারসনের সহযোগিতায়, ওয়াশিংটন দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। হ্যামিলটনের কৃতিত্বের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৪ খৃঃ হুইস্কি নামক স্থানে এক বিদ্রোহ হয়। কিন্তু সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এই সময় ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ে ইউরোপে নূতন রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র ইউরোপ নেপোলিয়নের পদানত হইলেও ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সংঘর্ষ চলিতেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল। এইজন্য ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় তাহারা বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেন। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ড ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। ইংরেজ নাবিকগণ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ অনুসন্ধান এবং আটক করিতে থাকে। ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের সহিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়। ওয়াশিংটনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়; হ্যামিলটনের নেতৃত্বে ফেডারেল দল এবং জেফারসনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দল (পরে গণতান্ত্রিক দল)।

কৃতিত্ব

নিরপেক্ষ নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতি ঃ ১৭৯৭ খৃঃ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া পদত্যাগ করেন। ফেডারেল দলভুক্ত এবং ওয়াশিংটনের বিশ্বস্ত অনুগামী এ্যাডামস্ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাহার সময়ে জেফারসনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দলের কার্যকলাপে দেশের ঐক্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৮০০ খৃঃ রিপাবলিকান দলের নেতা টমাস জেফারসন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত করেন এবং ব্যয় সংকোচ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তাহার পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। ১৮০৩ খৃঃ তিনি ফ্রান্সের নিকট হইতে সমগ্র লুসিয়ানা অঞ্চল ক্রয় করেন। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমা বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। নূতন অঞ্চলকে বিভক্ত করিয়া ছয়টি নূতন রাজ্য গঠন করা হয়।

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ ঃ ১৮১২ খৃঃ ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ হয়। নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিবার ফলে তাহার অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা' এবং ইংলণ্ডের পাল্টা ব্যবস্থার ফলে সমুদ্র-বক্ষে আমেরিকার বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হইতে থাকে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স উভয়েই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিবার ফলে যুক্ত-রাষ্ট্রের বাণিজ্য ধ্বংসের সন্মুখীন হয়। ফলে ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজগুলি যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ অনুসন্ধান এবং আটক করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না—সুদক্ষ নাবিকদের অধিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া বা বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইত। ফলে ১৮১২ খৃঃ ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৮১৪ খৃঃ ঘেণ্টের সন্ধি দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর নেপোলিয়নের পতন হওয়ায় যুদ্ধের মূল কারণও দূরীভুত হয়।

মনরো নীতি ঃ ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল এবং তাহারা যুক্তরাষ্ট্রকে

স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং স্বীয় শক্তিবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ঘটনাবলী হইতে দূরে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিল। আমেরিকার মাটীতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে ভবিষ্যতে শোষণ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না। ১৮২৩ খৃঃ স্পেন, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে দমন করিতে অগ্রসর হইলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মন্‌রো কংগ্রেসের নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করিবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রও ইউরোপের ঘটনাবলীতে হস্তক্ষেপ করিবে না। অর্থাৎ 'আমেরিকা কেবল আমেরিকা বাসীদের' এই নীতি ঘোষিত হইল। ইহাই ইতিহাসে মন্‌রো নীতি (Monroe Doctrine) নামে খ্যাত। বস্তুতঃপক্ষে ইহা ছিল আত্মরক্ষা-মূলকনীতি। এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশের রক্ষাকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়। আমেরিকায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপ রুদ্ধ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র একাধিক অঞ্চল অধিকার করিয়া নিজের শক্তি, আধিপত্য এবং পরিধি বৃদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত এই নীতি হইতে সাম্রাজ্যবাদী নীতির আবির্ভাব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃতি : সাম্রাজ্যবাদ : মন্‌রো নীতি প্রয়োগ করিবার পর যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমদিকে নূতন অঞ্চল অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। পূর্বেই লুসিয়ানা ক্রয় করিবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 'মিসিসিপি' উপত্যকায় সরকারের নিকট জমি কিনিয়া ইউরোপীয়গণ বসতি স্থাপন করিল। ক্রমে এই অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্যে পরিণত করা হইল। ১৮১৯ খৃঃ স্পেন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ফ্লোরিডা অর্পন করিল। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র টেক্‌সাস অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। ১৮৪৫ খৃঃ টেক্‌সাস যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই সময় হইতে সাম্রাজ্যবাদীনীতি অনুসরণ করিতে থাকে। রাষ্ট্রপতি পোক্ প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা বিস্তার করিবার নীতি গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর সহিত যুদ্ধ করিয়া কালিফোর্নিয়া

পশ্চিমদিকে বিস্তৃতি

এবং নিউ মেক্সিকো অধিকার করে এবং এবং টেক্সাস অঞ্চলে বিস্তৃত ভূখণ্ড গ্রাস করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবার ফলে ইহার গুরুত্ব অসাধারণ বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর অরিজন অধিকার করিবার ফলে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বিস্তৃত হইল। যুক্তরাষ্ট্রের এই বিস্তৃতির ফলে নূতন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইল। ইহা ব্যতীত পশ্চিমদিকে অধিকৃত নূতন রাজ্যগুলির অধিবাসীগণ গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহারা ছিল সমানাধিকারের পক্ষপাতী। পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা উচ্চশ্রেণী এবং অভিজাতগণের হস্তগত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীগণ ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরোধী। ১৮২৯ খৃঃ ইহাদের সমর্থনে এ্যানড্রু জ্যাকসন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

দাসপ্রথা ও গৃহযুদ্ধ : যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল দাসপ্রথা ও গৃহযুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের রাজ্যগুলি ছিল শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান। এই রাজ্যগুলিতে বহু কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। কল কারখানায় উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া মালিক ও বণিকগণ প্রচুর মুনাফা লাভ করিত এবং উপযুক্ত বেতন দিয়া মজুর নিয়োগ করিত। কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলি ছিল কৃষি প্রধান। অভিজাত ভূস্বামীগণ বিস্তৃত অঞ্চলে তূলার চাষ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিত। দক্ষিণের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো এই সকল তূলা-বাগিচার মালিকগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে বস্ত্র উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তূলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে মজুরের অভাব ছিল। ফলে তূলা বাগিচার মালিকগণ কৃষি কার্যে ব্যাপকভাবে ক্রীতদাস নিয়োগ করিত। দক্ষিণের রাজ্যগুলি ক্রীতদাসে ছাইয়া গিয়াছিল। ক্রীতদাসদের হাটে বাজারে বিক্রয় করা হইত। মনিব স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। ইহাদের মাত্র সামান্য আহার্য প্রদান করিয়া নির্মমভাবে খাটাইয়া লইত। নিষ্ঠুর মনিবদের ইহা খুবই লাভজনক ছিল কারণ ক্রীতদাসদের বেতন দিতে হইত না। কিন্তু

দাসপ্রথা

উত্তরের রাজ্যগুলি এই বর্বর প্রথার তীব্র বিরোধী ছিল। সেখানে উপযুক্ত মজুর পাওয়া যাইত। শিল্প প্রধান অঞ্চলে ক্রীতদাসের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহা ব্যতীত উত্তরাঞ্চলে এক শ্রেণীর মানব প্রেমিকদের আবির্ভাব হইয়াছিল যাহারা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। মিসেস হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো তাহার "আংকল টমস্ কেবিন" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ক্রীতদাসদের প্রতি মনিবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরেন। ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে আরম্ভ হইল তীব্র বিরোধ এবং সংঘর্ষ। ১৮৬০ খৃঃ যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদের সমর্থক আব্রাহাম লিংকন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন তখনই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংকট দেখা দিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলির ধারনা হইল লিংকন দাসপ্রথার উচ্ছেদ করিবেন। ১৮৬১ খৃঃ দক্ষিণের সাতটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া নূতন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি লিংকন এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিলেন না। দক্ষিণের রাজ্যগুলির কার্য অবৈধ ঘোষণা করিলেন। ফলে সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ

১৮৬১ খৃঃ হইতে ৬৫ খৃঃ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া গৃহযুদ্ধ চলিল। দক্ষিণের 'বিদ্রোহী' রাজ্যগুলির সহিত আরও চারিটি রাজ্য যোগদান করিল। ১৮৬৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মহামতি লিংকন এক ঘোষনার দ্বারা দাসপ্রথার উচ্ছেদ করিয়া ক্রীতদাসদের মুক্তি প্রদান করিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ গেটিস-বার্গের যুদ্ধে দক্ষিণের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল। জেনারেল লী'র অসীম বীরত্ব সত্ত্বেও দক্ষিণের সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত পরাজিত হইতে লাগিল। অবশেষে জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করিলেন। গৃহযুদ্ধের

যুদ্ধ

আব্রাহাম লিংকন

অবসান হইল, ক্রীতদাসরা মুক্তি পাইল, বর্বর প্রথার অবসান হইল, যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রহিল। গৃহযুদ্ধের অবসানের অল্পদিন পরেই এক নাট্যশালায় আততায়ীর গুলিতে মহামতি লিংকন নিহত হন। ওয়াশিংটন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা—লিংকন ছিলেন ইহার রক্ষাকর্তা। জাতির সংকট মুহূর্তে তিনি যে অনমনীয় দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি এবং দেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি ছিলেন মানবতা ও গণতন্ত্রের পূজারী। তিনি সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার বাণী ছিল "Govt of the people, for the people, by the people".

গৃহযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রঃ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদঃ লিংকনের পর এনড্রু জ্যাকসন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি লিংকনের ন্যায় উদার মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসে রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ইহারা দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ নীতি অবলম্বন করে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির শ্বেতকায়দের ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া মুক্ত ক্রীতদাসের পূর্ণ নাগরিকত্ব ঘোষণা করা হয় এবং ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। রিপাবলিকান দল মনে করিত দক্ষিণের রাজ্যগুলি বিজিত অঞ্চল। নিগ্রোদের বিভিন্ন সরকারী পদে নিয়োগ করা হইল। দক্ষিণের রাজ্যগুলির ক্রুদ্ধ শ্বেতাকায়গণ নিগ্রো আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য 'কু-ক্লুকস্-ক্ল্যান' নামে এক গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া নিগ্রোদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। ক্রমে শ্বেতকায়দের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিনের মধ্যে বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অবসান হইল। ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির অভ্যুদয় হইল।

দক্ষিণের রাজ্যগুলি সম্পর্কে নীতি

গৃহযুদ্ধের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যানবাহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। রেলপথ স্থাপিত হয় এবং রাস্তাঘাট নির্মিত হয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ক্রমে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পোন্নয়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের অভাবনীয়

অগ্রগতি হয়। বহু বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। অজস্র খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইবার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ধনকুবেরদের দেশে পরিণত হইল। বড় বড় শহর এবং বন্দরে যুক্তরাষ্ট্র ছাইয়া গেল। রাষ্ট্রের আয়তনও বৃদ্ধি পাইল। রাজ্য সংখ্যা হইল আটচল্লিশটি। সম্প্রতি আলাস্কা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে রাজ্য সংখ্যা উনপঞ্চাশটি হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের ফলে শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হইল—ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং চীন ও জাপান হইতে বহু সংখ্যক লোক বসবাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত আইন করিয়া ইহাদের আগমন নিয়ন্ত্রন করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

শিল্পোন্নয়ন

গৃহযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাষ্ট্র উগ্র পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। নিজের সুবিধা অনুযায়ী মনরোনীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং আমেরিকা মহাদেশে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিল। ১৮৩৯-৯৭ খৃঃ পর্যন্ত আমেরিকা মহাদেশে ক্রমাগত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তৃত হইতে থাকে। ১৮৯৮ খৃঃ স্পেনীয় উপনিবেশ কিউবায় এক বিদ্রোহ হয়। এই সময় ক্লিভল্যাণ্ড ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি কিউবার বিদ্রোহে হস্তক্ষেপ করিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর নিকট স্পেনীয় নৌবাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। ১৮৯৮ খৃঃ প্যারিসের সন্ধি দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিউবা যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাধীনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের নিকট হইতে পোর্টোরিকো, গুয়াম এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পাইল। এই যুদ্ধের মধ্য হইতেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হইল। ১৮৯৮ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপ অধিকার করে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে। জাপানের দ্রুত উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হয়। কারণ জাপানের শক্তি বৃদ্ধি হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার স্বার্থ বিপন্ন হইবে এবং চীনের বিরাট বাজার তাহার হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। দূর প্রাচ্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল, কিন্তু আমেরিকা মহাদেশে কোন ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ বিস্তারে বাধা প্রদান করিল। আমেরিকা মহাদেশে নিজের

উগ্র পররাষ্ট্র নীতি

অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তারের জন্য এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির স্বার্থ বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মন্‌রোনীতি প্রয়োগ করিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল। ১৯০১ খৃঃ থিয়োডোর রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাহার মধ্যস্থতায় রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হয়। তাহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে পানামা খালের উপর যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি-বৃদ্ধিতে জাপানের সহিত তাহার বিরোধের সূচনা হইল। ১৯০৬ খৃঃ মরোক্কো সমস্যার সমাধানকল্পে যুক্তরাষ্ট্র আলজিয়ার্স সম্মেলনে যোগদান করে। ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হইল। রুজভেল্টের পর উইলসন রাষ্ট্রপতি হন। তিনি বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু জার্মানী যখন সাবমেরিণের দ্বারা আমেরিকার জাহাজ ধ্বংস করিতে লাগিল তখন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব শক্তিতে পরিণত

দক্ষিণ আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ বণিকগণ খনিজ সম্পদ এবং বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের আগমনের বহু পূর্বেই দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে আজেটক ও মায়া সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার কোন যোগাযোগ ছিল না। স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ নাবিকগণ আসিয়া নির্মমভাবে আদিম অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করিল। দু'হাতে মহাদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ক্রমে স্পেন ও পর্তুগালের কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হইল। উপনিবেশগুলি ছিল শোষণের ক্ষেত্রে, সুতরাং শিল্প এবং শিক্ষায় অনগ্রসর হইয়া রহিল। আদিম অধিবাসীগণ যাহারা জীবিত ছিল তাহারা ঔপনিবেশিকদের দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ১৭৭৬ খৃঃ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দক্ষিণ আমেরিকার নির্যাতিত মানুষদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ফরাসী দার্শনিকদের রচনা এবং ফরাসী বিপ্লবের বাণী দক্ষিণ আমেরিকার মানুষদের মনে স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাংখা তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। আরম্ভ হইল দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম। ১৮২২ খৃঃ ভেরোনা কংগ্রেসে স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশ গুলিকে দমন করিবার জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ইংলণ্ডের তীব্র বিরোধিতার ফলে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সম্ভব হইল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও মন্‌রো নীতি ঘোষণা করিয়া আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করিল। ফলে দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের নায়কগণ উৎসাহিত হইলেন। মুক্তি সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে মিরান্দা, মিগুয়েল হিদালগুর এবং সাইমন বলিভারের নাম উল্লেখযোগ্য। ত্যাগ, বীরত্ব এবং স্বদেশপ্রেমের জন্য সাইমন বলিভার সংগ্রামী নেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছেন। তাহার স্বপ্ন ছিল দক্ষিণ আমেরিকায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। কিন্তু তাহার স্বপ্ন সফল হয় নাই।

মুক্তিসংগ্রাম

১৮১৬ খৃঃ আর্জেন্টিনা, ১৮১৮ খৃঃ চিলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ১৮২২ খৃঃ ব্রেজিল পর্তুগালের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া গেল। ইহার পরই পেরু, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর এবং বলিভিয়া স্বাধীন হইল। ১৮১১ খৃঃ প্যারাগুয়ে স্বাধীন হয়। ১৮২৫ খৃঃ মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা অর্জন করিল। ১৮২৩ খৃঃ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মেক্সিকো স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইল। কষ্টারিকা, গুয়েটামালা নিকারাগুয়া, এল স্যালভাডর, হণ্ডুরাস প্রভৃতি দেশও ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করিল। সর্বশেষে ১৮৯৮ খৃঃ কিউবা স্বাধীন হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ

স্বাধীনতা অর্জন করিলেও দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির দ্রুত উন্নতি হয় নাই। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অনবরত পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। অধিকাংশ রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে

অনেকগুলি রাজ্যে একনায়কত্বের উদ্ভব হয়। ১৮৬৫ খৃঃ আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল ও উরুগুয়ের সহিত পাঁচ বৎসর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দুর্বল হইয়া পড়ে। বলিভিয়া, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়া এবং গুয়েটামালার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। একাধিক বিপ্লবের ফলে কলম্বিয়ার শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। ১৮৭৯-৮৩ খৃঃ পেরু এবং বলভিয়ার সহিত চিলি এক ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া মেক্সিকোকে বিস্তৃত অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতে হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পানামা বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯০৩ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্র পানামার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে পানামা খাল ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মধ্য আমেরিকার নিকটে আটলান্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ ক্যারিবিয়ান নামে পরিচিত। এখানকার হাইতি, স্যাণ্টোডোমিনিগো, কিউবা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিত রাজ্য।

আভ্যন্তরীন সংঘর্ষ

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বর্তমানে কুড়িটি রাজ্য আছে: আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ইকুয়েডর, পেরু, ভেনিজুয়েলা, পানামা, নিকারাগুয়া, কলম্বিয়া, কষ্টারিকা, মেক্সিকো, স্যালভেডর, হণ্ডুরাস, গুয়েটা-মালা, বলিভিয়া, হাইতি, কিউবা এবং সাণ্টো ডামিনিগো। এই রাজ্যগুলিতে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে। চিনি, তামাক, তূলা, রবার, কফি, কোকো, বাদাম প্রচুর উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদও প্রচুর। সোনা, কয়লা প্রভৃতি আবিস্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে রেলপথ এবং বহু কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার হইয়াছে। স্পেনীয় ও পর্তুগীজ শাসনাধীনে দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এইজন্য দক্ষিণ আমেরিকায় ল্যাটিন প্রভাব বিদ্যমান।

বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৭৮৩ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ।
১৭৮৯ রাষ্ট্রপতি পদে ওয়াশিংটন
১৮০৩-৪৮ যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তার।
১৮১০ মেক্সিকোর বিদ্রোহ।
১৮১১-২৫ দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লাভ।
১৮৬০ রাষ্ট্রপতি পদে আব্রাহাম লিংকন।
১৮৬১ গৃহযুদ্ধ।
১৮৬৫ লিংকন নিহত।
১৮৮৯ সর্ব আমেরিকান সম্মেলন।
১৮৯৮-১৯১৪ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the history of U. S. A. **from Independence** to the begining of the First World War (1914).

স্বাধীনতা অর্জনের পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Briefly describe the causes and results of the American Civil War.

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ এবং ফলাফল বর্ণনা কর।

3. Trace the rise of American Imperialism in the begining of the present century.

বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব আলোচনা কর।

4. Narrate briefly the history of South America.

দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

5. Write Notes on ; (a) Monroe Doctrine (b) Abraham Lincoln.

টীকা লিখ : (ক) মনরো নীতি ; (খ) আব্রাহাম লিংকন।

সপ্তম অধ্যায়

চীন ও জাপানের ইতিহাস

চীন

চীনে ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রবেশ ঃ চীন ও জাপান উভয়েই ভারতের ন্যায় এশিয়ার দুইটি সুপ্রাচীন দেশ। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি চীন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উভয় দেশই সামন্ত প্রথা, কুসংস্কার ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন ছিল। চীনের সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্কই প্রায় ছিল না। চীনাগণ নিজেদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জন্য গর্বিত ছিল এই জন্য তাহারা কোনদিনই বিদেশীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ চীনের দক্ষিণে ম্যাকাও নামক স্থানে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজগণ ক্যাণ্টনে এবং ওলন্দাজগণ ফরমোজা দ্বীপে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু চীনা সরকার 'বর্বর' ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিনষ্ট করিবার জন্য নানাভাবে তাহাদের বাণিজ্যের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে এবং উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করে।

শান্তিপূর্ণভাবে চীনের সম্পদ লুণ্ঠন করিতে ব্যর্থ হইয়া ইউরোপীয় জাতিগুলি বল প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইল। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনের সহিত লাভজনক আফিংএর ব্যবসা চালাইত। কিন্তু এই সর্বনাশা নেশার কবল হইতে জাতিকে বাঁচাইবার জন্য চীনা সরকার বারংবার চীনে আফিং আমদানী নিষিদ্ধ করেন। ১৮০০ খৃঃ আফিং ব্যবসা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উৎকোচগ্রহণকারী চীনা কর্মচারীদের সহযোগিতায় ইংরেজরা বেআইনীভাবে আফিং আমদানী করিতে লাগিল। ফলে চীনের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ ঃ চীন সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজগণ আফিংএর ব্যবসা চালাইতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি আফিং ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া চীন

সরকার এই সর্বনাশা ব্যবসা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। ১৮৩৯ খৃঃ চীন সরকারের আদেশে ইংরেজদের ২০,০০০ বাক্স আফিং আটক করিয়া বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ফলে ১৮৪০ খৃঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাই প্রথম আফিং যুদ্ধ নামে খ্যাত। পরাজিত চীন নানকিংএর সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল।

প্রথম আফিং যুদ্ধ, নানকিংএর সন্ধি

এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী চীন, ইংলণ্ডকে হংকং অর্পণ করিল এবং ক্যাণ্টন, ফুচৌ, নিঙ্পো, এময় এবং সাংহাই বন্দরে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করিল। ইহা ব্যতীত চীন প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিল। কিন্তু আফিংএর সমস্যার কোন মীমাংসা হইল না। বরং চীনের বাণিজ্যে বৈদেশিকদের অধিকার আইনসিদ্ধ হইল, ইংরেজগণ অধিকতর উৎসাহে বেআইনী এবং নিন্দনীয় আফিং ব্যবসা চালাইতে লাগিল। ১৮৪৪ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স চীনে বাণিজ্য করিতে অগ্রসর হইল। অনতিবিলম্বে হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, পর্তুগাল এবং প্রাশিয়াও চীনের নিকট হহতে পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার আদায় করিয়া লইল।

ফলাফল

প্রথম আফিং যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছিল চীন শক্তিহীন। সুতরাং ইংলণ্ড চীনের নিকট হইতে আরও সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। একজন ফরাসী মিশনারী চীনে নিহত হইয়া ছিলেন এবং ইংরেজ পতাকাবাহী একখানি জাহাজকে চীনারা আটক করিয়াছিল। এই অজুহাতে কোন অনুসন্ধান না করিয়াই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৫৬-৫৮)। ইহাই দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সম্মিলিত বাহিনী চীনের রাজধানী পিকিং অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। চীন সম্রাট সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৫৮ খৃঃ চীন সম্রাট পৃথকভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত তিয়েনসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন চীন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিল; পিকিংএ বৈদেশিক দূত থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল; এগারটি নূতন

দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ

তিয়েনসিনের সন্ধি; ফলাফল

বন্দরে বৈদেশিকগণ অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইল ; চীন সরকার খৃষ্টান মিশনারীদের রক্ষা করিতে এবং বৈদেশিকদের চীনের অভ্যন্তরে বিনা বাধায় ভ্রমণ করিতে দিতে স্বীকৃত হইল। এই সন্ধির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সর্ত হইল বৈদেশিকগণকে চীনের আইন আদালতের আওতা হইতে মুক্তিদান (Extra territoriality)। ইহা অত্যন্ত অপমানজনক সন্ধি। চীনে অবস্থানকারী বৈদেশিকদের উপর চীন সরকারের কোন কর্তৃত্ব রহিল না।

তাই পিং বিদ্রোহ : একদিকে বৈদেশিক আক্রমণ এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ চীনের অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিল। হুং সিন-চুয়ান নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্তির নেতৃত্বে চীনের মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথমে এই বিদ্রোহ ছিল একটি ধর্মীয় আন্দোলন। দলে দলে লোক চুয়ানের পতাকা তলে সমবেত হইতে থাকে। ইহাতে ভীত হইয়া চীন সম্রাট তাহার কার্যকলাপ অবৈধ ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার ফলে ব্যাপক গণবিদ্রোহ দেখা দিল। চুয়ান নিজেকে সম্রাট (Heavenly King) ঘোষণা করিলেন এবং মাঞ্চুবংশের অবসান করিয়া একটি নুতন বংশ—তাইপিং (মহান শান্তি) বংশ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। তিনি তাহার অনুগামীদের লইয়া উত্তর চীনে অগ্রসর হইলেন এবং বারংবার চীনসম্রাটের বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। অতঃপর বিদ্রোহীগণ নানকিং অধিকার করিয়া রাজধানী স্থাপন করিল। এগার বৎসর (১৮৫৩-৬৪) নানকিং বিদ্রোহীদের কবলে ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৫ খৃঃ বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে চীন সম্রাট বিদ্রোহীদের নির্মূল করেন। তাইপিং বিদ্রোহ প্রমাণ করিল চীনের কোন শক্তি নাই—শাসনব্যবস্থা অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্থ। সুতরাং চীন ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

চীন-জাপান যুদ্ধ ১৮৯৪-৯৫ : চীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শোষনের জন্য উন্মুক্ত হইল। তিয়েনসিনের সন্ধির ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল ইউরোপীয় জাতি চীনে প্রবেশ করিল। অতঃপর সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ড চীনসম্রাটকে চি-ফু চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য

করিল। আরও চারটি বন্দর ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। ইংরেজগণ অনেক সুযোগ সুবিধা পাইল। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিগুলি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক অধিকারে সন্তুষ্ট না হইয়া রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইল। শুধুমাত্র ইউরোপীয় জাতিগুলি নহে—জাপানও চীনে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইল, জাপান লুচু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিল। কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরিয়া চীনের অধীন করদ রাজ্য হইলেও কার্যতঃ প্রায় স্বাধীন ছিল। চীন কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করিত না। কিন্তু ইহার ফলে কোরিয়ায় বিশৃংখলা এবং অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সুযোগে রাশিয়া এবং অন্যান্য শক্তিগুলি কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। ইহাতে জাপান ভীত হইয়াছিল—কারণ কোরিয়া ইউরোপীয় শক্তিগুলির হস্তগত হইলে তাহার বিপদ উপস্থিত হইবে। সুতরাং জাপান নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮৫৪ খৃঃ জাপানী সৈন্যবাহিনী চীনের যুদ্ধজাহাজের উপর গুলি বর্ষণ করিল। সুতরাং চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সকলের ধারণা ছিল বিরাট চীন ক্ষুদ্র জাপানকে ধ্বংশ করিবে। কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও পুনর্গঠিত জাপানী সৈন্যবাহিনী কোরিয়া হইতে চীনাদের বিতাড়িত করিল

যুদ্ধের কারণ; কোরিয়া সমস্যা

এবং ইয়ালু নদীতে চীনা নৌবহর বিধ্বস্ত করিল। অতঃপর জাপানী সৈন্যবাহিনী মাঞ্চুরিয়া এবং পোর্ট আর্থার অধিকার করিয়া পিকিং অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বিপন্ন চীন সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। ১৮৯৫ খৃঃ শিমোনোসেকির সন্ধি দ্বারা চীন, কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল; লিয়াও-তুং উপদ্বীপ, ফরমোজা এবং পেসকাডোর দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে ছাড়িয়া দিল; প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল এবং চারিটি নূতন বন্দর বৈদেশিকদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিল। জাপানের শক্তি এবং মর্যাদা

শিমোনোসেকির সন্ধি

বৃদ্ধি পাইল। চীনের দুর্বলতা পুনরায় প্রমানিত হইল। "The Sino Japanese war was the most critical and decisive event in the modern history of the Far East"—Ketelbey.

কিন্তু জাপানের এই সাফল্যে অন্যান্য শক্তিগুলি ঈর্ষান্বিত হইল। রাশিয়ার প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং রাশিয়া এই সন্ধির সর্ত পরিবর্তনের দাবী জানাইল। ফ্রান্স এবং জার্মানীও রাশিয়ার সহিত যোগ দিল।

ত্রিশক্তির হস্তক্ষেপ

ত্রিশক্তির হস্তক্ষেপের ফলে জাপান লিয়াও-তুং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরাইয়া দিল। পরিবর্তে অবশ্য জাপান আরও ক্ষতিপূরণ পাইল। এইভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলি জাপানের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল। কিন্তু সমস্যা মিটিল না।

ইউরোপীয় শক্তিগুলির অধিকার বিস্তারঃ শীঘ্রই চীনের তথা কথিত শুভাকাংখী ইউরোপীয় শক্তিগুলির স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। জাপানকে ক্ষতিপুরণ দানের জন্য রাশিয়া এবং ফ্রান্স চীনকে প্রচুর ঋণ প্রদান করিয়াছিল। ইহার পরিবর্তে তাহারা চীনের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ নির্মানের অধিকার পাইল। ১৮৯৭ খৃঃ দুই জম জার্মান মিশনারীর হত্যার অজুহাতে জার্মানী কিয়াও চাও বন্দর ও জেলা নিরানব্বুই বৎসরের জন্য ইজারা লইল। ফ্রান্স কোয়াং চুয়ান ইজারা লইল এবং টংকিং হইতে য়ুনান পর্যন্ত রেলপথ নির্মানের অধিকার পাইল। রাশিয়া পঁচিশ বৎসরের জন্য পোর্ট আর্থার এবং তালিন ওয়ান ইজারা লইল এবং মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ব্লাডিভষ্টক পর্যন্ত ট্রান্স—সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মানের অধিকার পাইল। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ইংলণ্ড ওয়ে-হাই-উই এবং হংকং এর বিপরীত দিকে বিস্তৃত অঞ্চল ইজারা লইল। তথাপি ইহাতে শক্তিবর্গের লালসা মিটিল না। তাহারা এক একটি অঞ্চল নিজেদের 'প্রভুত্ব এলাকা' বলিয়া, চিহ্নিত করিতে লাগিল। ইংলণ্ড ইয়াংসি উপত্যকা, জার্মানী সানটুং, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া, ফ্রান্স হাইনান ও টংকিং এর সীমান্ত অঞ্চল এবং জাপান ফুকিন নিজ নিজ এলাকা বলিয়া নির্দিষ্ট করিল। কার্যতঃ শক্তিবর্গ চীন বিভাগ করিতে

অগ্রসর হইল। ব্যবসা, বাণিজ্য শিল্প, শুল্ক, রেলপথ, ডাকবিভাগ বৈদেশিক শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রনাধীন হইল।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে চীনের অবধারিত পতনের সম্ভাবনা দূরীভূত হইল। যুক্তরাষ্ট্র চীনে 'উন্মুক্ত দ্বার' নীতি অনুসরণের দাবী জানাইল।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতি

চীনের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ যুক্তরাষ্ট্র এই দাবী করে নাই। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বিক্রয়ের জন্য চীনের বাজার তাহার প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই যুক্তরাষ্ট্র চীনের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিল। যুক্তরাষ্ট্র চীনের সর্বত্র সকল জাতির অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবী করিল (১৮৯৯)। রাশিয়া ব্যতীত সকল রাষ্ট্র এই দাবী স্বীকার করিয়া লইল।

বক্সার বিদ্রোহ: বৈদেশিক শক্তিগুলি যখন চীন লুণ্ঠন ও বিভাগ করিতে মত্ত, তখন চীনের অভ্যন্তরে এক গুরুতর বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ইহা 'মুষ্টি যোদ্ধাদের বিদ্রোহ' বা বক্সার বিদ্রোহ নামে খ্যাত। বিদেশীদের শোষণ ও নিস্পেষণের বিরুদ্ধে ইহাই চীনাদের প্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীগণ বিদেশীদের 'দানব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। তাহারা চীন হইতে সমস্ত বৈদেশিক প্রভাব নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বিদেশীদের হত্যা করিতে লাগিল। জার্মানীর রাষ্ট্রদূতকে পিকিংএর রাস্তায় গুলি করিয়া হত্যা করা হইল (১৯০০)। অতঃপর বিদ্রোহীগণ বৈদেশিক দূতাবাসগুলি ঘেরাও করিল। ইতিমধ্যে বিদেশী শক্তিগুলি এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিল। চীন সরকার বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইল এবং উত্তর চীনে একটি বৈদেশিক সেনা নিবাস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিল।

সংস্কার আন্দোলন: চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে প্রমানিত হইয়াছিল চীনের দুর্বল শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন। পাশ্চত্য সভ্যতা গ্রহণ করিবার ফলে জাপান দ্রুত শক্তিশালী হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের অনুকরণে চীনে পুনর্গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হইল। সম্রাট কোয়াং সু সংস্কার

আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ খৃঃ প্রায় একশত দিন ধরিয়া বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। এই জন্য ইহা 'শত দিনের সংস্কার' নামে পরিচিত। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ, বিদেশে ভ্রমন এবং বিদেশী সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা করা হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করা হইল। পাশ্চাত্যের অনুকরণে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত করা হইল। কিন্তু চীনকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাজমাতা ৎসু সী সংস্কার বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের নেত্রী হইয়া সম্রাটকে তাহার হস্তে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্পন করিতে বাধ্য করিলেন। সমস্ত সংস্কার প্রত্যাহার করা হইল।

চীনের বিপ্লবঃ সান-ইয়াৎ-সেনঃ শতদিনের সংস্কার ব্যর্থ হইলেও চীনের জনসাধারণ অনুভব করিয়াছিল যে চীনকে শক্তিশালী করিতে হইলে শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিতেই হইবে। চীনের তরুণ সমাজ দ্রুত সংস্কার প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। দেশের দুর্দশার জন্য তাহারা দুর্নীতিগ্রস্থ এবং অপদার্থ মাঞ্চু সম্রাটকে দায়ী করিল। বহুকাল ধরিয়া মাঞ্চুবংশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ সম্রাট ও রাজমাতার মৃত্যু হইলে এক নাবালক চীনের সিংহাসনে আরোহণ করে। দেশে দলাদলি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময় চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সান-ইয়াৎ-সেন নামক এক অসাধারণ শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়। সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন ক্যাণ্টনের অধিবাসী একজন ডাক্তার। তিনি কুয়োমিণ্টাং দল গঠন করেন। তাহার নেতৃত্বে দক্ষিণ এবং মধ্য চীনে বিরাট গণ আন্দোলন আরম্ভ হইল। সান-ইয়াৎ-সেন এবং তাহার অনুগামীগণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইলেন। ইহাতে ভীত হইয়া চীন সরকার ১৯১০ খৃঃ জাতীয় সভা আহবান করিয়া ব্যাপক সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন এবং তাহার অনুগামীগণ মাঞ্চুবংশের সহিত কোন প্রকার আপোষ করিতে অসম্মত হইলেন। ১৯১১ খৃঃ ডাঃ সানের নেতৃত্বে মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণবিপ্লব আরম্ভ হইল। নানকিংএ রাজধানী স্থাপন করিয়া চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপ্লবী নেতা ডাঃ সান প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

চীন বিপ্লব

হইলেন। ১৯১২ খৃঃ মাঞ্চুসম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। সুতরাং মাঞ্চু বংশের অবসান হইল।

কিন্তু ডাঃ সান শীঘ্রই সেনাপতি য়ুয়ান-শী-কাইএর অনুকূলে পদত্যাগ করিলেন। তাহার আশা ছিল য়ুয়ান-শী-কাইএর ন্যায় শক্তিশালী নেতার অধীনে প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী হইবে। কিন্তু য়ুয়ান-শী-কাই প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ফলে দলাদলি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল। ডাঃ সান দক্ষিণ চীনে পুনরায় কুয়োমিণ্টাং দল শক্তিশালী করিয়া পিকিংএর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৯১৬ খৃঃ য়ুয়ান-শী-কাইএর মৃত্যুতে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীভূত হইল। লী-য়ুয়ান-হুয়াং নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।

য়ুয়ান শী-কাই

ইতিমধ্যে চীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধের সুযোগে জাপান চীনের নিকট একুশ দফা দাবী উপস্থিত করিল। মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় জাপান বিশেষ অর্থনৈতিক ও পুলিশী অধিকার দাবী করিল। চীন সরকার দাবীগুলি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯১৭ খৃঃ চীন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই চীনে ধীরে ধীরে জাপানের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল। যুদ্ধশেষে চীনকে শান্তি সম্মেলনে আহ্বান করা হইল। ১৯২১-২২ খৃঃ ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব শক্তি-বর্গের স্বীকৃতি লাভ করিল। জাপান সাটটুং অঞ্চল চীনকে প্রত্যর্পণ করিল। চীনেরআন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

বিশ্বযুদ্ধে চীন

সান-ইয়াৎ সেন

১৯১৭ খৃঃ পিকিং সরকারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া পুনর্গঠিত

চীন ও জাপান
রা শি য়া
বা হি র মংগো লি য়া
মা ঞ্চু রি য়া
শাখালিন
হোক্কাইডো
ব্লাডিভস্টক
মুকডেন
কোরিয়া
টোকিও
ওসাকা
শিকোকু
কিয়ুশু
নাগাসাকি
পিকিং
পোর্ট আর্থার
চীনের প্রাচীর
শা ন টাং
চী ন
তি ব্ব ত
নেপাল
ভুটান
নানকিং
সাংহাই
হ্যানকৌ
নিংপো
ফুচাও
এময়
ফরমোজা
ক্যান্টন
হংকং
ভা র ত
ব্র হ্ম দে শ
ফরাসী ইন্দোচীন
শ্যাম

কুয়োমিণ্টাং দল ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে রাষ্ট্রপতি করিয়া ক্যাণ্টনে চীনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করিল। চীন উত্তর ও দক্ষিণে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গেল, উত্তর চীনকে প্রজাতন্ত্রের অধীনে আনিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ডাঃ সান কুয়োমিণ্টাং দলকে শক্তিশালী করিলেন এবং রাশিয়ার সাহায্যে চীনকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করিলেন। ডাঃ সানের উদ্দেশ্য ছিল, জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করা। ডাঃ সান নূতন চীনের ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতীক—চীনের জাতীয়তাবাদ ও চীনের বিপ্লবের জনক। ১৯২৫ খৃঃ পিকিংএ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার প্রিয় শিষ্য চিয়াং কাইশেকের উপর চীনকে শক্তিশালী করিবার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইল।

ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্ব

জাপান

প্রাচীন জাপান: জাপানীরা নিজেদের মাতৃভূমিকে 'নিপ্পন' বা 'উদিত সূর্যের দেশ' বলিয়া অভিহিত করিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল। অবশ্য জাপানীগণ ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বণিকগণ এবং জেসুইট মিশনারীদের জাপানে প্রবেশাধিকার দিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্মের প্রচারে ভীত হইয়া জাপানীগণ ১৫৮৭ খৃঃ মিশনারীদের দেশ হইতে বহিস্কৃত করে। ১৫৯১ খৃঃ জাপান হইতে খৃষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য প্রায় ২০,০০০ খৃষ্টধর্মাবলম্বীকে হত্যা করা হয়। ১৬৩৭ খৃঃ দুইটি আইন করিয়া বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। মাত্র কয়েকজন ওলন্দাজ ব্যবসায়ী বাণিজ্য করিবার অধিকারলাভ করে।

জাপানের শাসন ব্যবস্থা ছিল সামরিক এবং সামন্ততান্ত্রিক। সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মিকোডো বা সম্রাট। কিন্তু তিনি ছিলেন নামে মাত্র সম্রাট—দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন 'সোগান'। 'সোগান' বংশানুক্রমিক ভাবে ক্ষমতালাভ করিতেন। 'সোগানে'র নীচেই ছিল সামন্ত শ্রেণী বা 'ডাইমিউগণ'। ইহাদের নীচেই ছিল 'সামুরাই' বা যোদ্ধাশ্রেণী।

সামুরাইদের সমর্থনে 'ডাইমিউ'গণ 'সোগান'এর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিত। সুতরাং জাপান ছিল সীমান্ত শ্রেণীর প্রভাবিত একটি অনগ্রসর রক্ষণশীল রাষ্ট্র।

কমোডোর পেরীর আগমন ঃ ১৮৫৩ খৃঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বহরের কমোডোর পেরীর নেতৃত্বে চারিখানি যুদ্ধজাহাজ জাপানের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাপান সরকারের নিকট পেরী দাবী করিলেন যে জাপানের উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজডুবি বা বিধ্বস্ত হইলে নাবিকগণকে আশ্রয় প্রদান করিতে হইবে এবং রসদ সংগ্রহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ জাপানের বন্দরে নোঙ্গর করিতে দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির মহড়া দেখিয়া জাপান দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। ১৮৫৪ খৃঃ এক চুক্তির দ্বারা 'সোগান' দুইটি বন্দরে আমেরিকার জাহাজ ভিড়াইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ইউরোপীয় জাতিগুলি ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিল না। ইংলণ্ড, রাশিয়া এবং হল্যাণ্ড জাপানের নিকট হইতে একই ধরনের সুবিধা আদায় করিয়া লইল। পরে আমেরিকার সহিত আর একটি চুক্তির ফলে জাপান আরও চারিটি বন্দর বৈদেশিকদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিল। বৈদেশিকগকে জাপানের আইন আদালতের আওতা হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। সকল জাতিই ক্রমে ক্রমে জাপানে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার আদায় করিয়া লইল।

বৈদেশিকদের আগমনের ফল ঃ বৈদেশিকদের আগমন জাপানীগণ সুনজরে দেখে নাই। বৈদেশিকদের আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। জাপানীগণ 'সোগান'কে এই অবস্থার জন্য দায়ী করিল এবং সোগানের পদত্যাগ দাবী করিল। বৈদেশিকদের সামরিক শক্তির সম্মুখে মাথা নত না করিয়া সোগানের উপায় ছিল না। শক্তিশালী 'ডাইমিউ'গণ 'সোগানে'র পদ বিলুপ্ত করিয়া সম্রাটের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পনের দাবী করিল। কিন্তু একজন ইংরেজ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ নৌ বহর কাগোসিমা সহর কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করিল (১৮৬৩)। পর বৎসর একজন 'ডাইমিউ'র উদ্ধত কার্যের শাস্তি বিধানের জন্য ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ ও আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ শিমোনোসেকি গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত

করিল। ইহার ফলে 'ডাইমিউ'গণ উপলব্ধি করিল বৈদেশিকদের বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। তাহারা রাতারাতি বৈদেশিক সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হইল। কিন্তু তাহারা 'সোগান'কে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। 'সোগানে'র পদ বিলুপ্ত করা হইল। সম্রাট মুৎসুহিতোর হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পন করা হইল। তাহার শাসন ক্ষমতালাভকে 'মেইজি'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাহার শাসনকালকে 'মেইজি' বলা হয়। ১৮৬৮ খৃঃ ২৫ জানুয়ারী 'মেইজি' যুগ আরম্ভ হয় এবং মুৎসুহিতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই যুগ শেষ হয়, ৩০শে জুলাই ১৯১২ খৃঃ।

জাপানের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ঃ 'সোগানে'র পদত্যাগের সময় হইতে জাপানের নবযুগ আরম্ভ হয়। সম্রাটের ক্ষমতা লাভের পর শক্তিশালী 'ডাইমিউ' বা সামন্তগণ স্বেচ্ছায় সম্রাটের নিকট তাহাদের সকল ক্ষমতা পরিত্যাগ করিল। ক্রমে সমস্ত সামন্তগণ সম্রাটের নিকট তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার ও সম্পত্তি অর্পন করিল। 'সামুরাই' বা যোদ্ধা শ্রেণী ও তাহাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং ক্ষমতা পরিত্যাগ করিল। ১৮৭১ খৃঃ সম্রাট আইন প্রণয়ন করিয়া সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত করিলেন। সকল শ্রেণী হইতে লোক লইয়া জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইল। 'সামুরাই' এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইল। পশ্চিমের ন্যায় সুদক্ষ, সভ্য এবং শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবার জন্য জাপান সম্পূর্ণ ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিল। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জাপান সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমী জাতির অনুকরণে পুনর্গঠিত হইয়া বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল।

ডাইমিউ ও সামুরাইদের ক্ষমতা পরিত্যাগ

১৮৮৯ খৃঃ জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্রাট নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিলেন। সম্রাট রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। তাহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য দুইকক্ষ বিশিষ্ট ডায়েট বা পার্লামেণ্ট গঠন করা হইল। পুরানো আইনের পরিবর্তন করিয়া প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের অনুকরণে নূতন আইন প্রবর্তন করা হইল। আইনের চক্ষে সকলে সমান বলিয়া পরিগণিত হইল। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি

পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুযায়ী পুনর্গঠন

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইল। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদেশিক শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হইল। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল। জার্মানীর কায়দায় সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হইল এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হইল। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে নৌবাহিনী গঠন করা হইল। দ্রুতগতিতে জাপানের সর্বত্র রেলপথ, টেলিগ্রাফ এবং পোতাশ্রয় প্রভৃতি স্থাপিত হইল। জাহাজ ও ষ্টীমার চলাচল আরম্ভ হইল, বহু কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল; খনি খননের ব্যবস্থা করা হইল। ব্যবসা বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইল। ১৮৮৭ খৃঃ পর হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সাতাশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হইল এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপ দ্রুত এবং পরিপূর্ণভাবে বৈদেশিক সভ্যতা গ্রহণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ১৯০০ খৃঃ মধ্যে জাপান ইউরোপের যে কোন রাষ্ট্রের ন্যায় একটি আধুনিক এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ঃ জাপান শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইল না; পাশ্চাত্য শক্তিগুলির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। জাপানের ধারণা হইল ইউরোপীয় শক্তিগুলির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ না করিলে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ১৮৭২ খৃঃ হইতে জাপান চীনের বিভিন্ন অংশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। দুই বৎসর পর জাপান লুচু-দ্বীপপুঞ্জ চীনের নিকট হইতে অধিকার করিল। রাশিয়ার সহিত এক চুক্তির দ্বারা জাপান কিউরিল দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিল। ১৮৭৮ খৃঃ বনিন দ্বীপপুঞ্জ জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। অতঃপর জাপান কোরিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) ঃ চীন-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস পূর্বেই চীনের ইতিহাসে আলোচনা করা হইয়াছে। কোরিয়ার উপর আধিপত্য লইয়াই চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। চীনের ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রকে পরাজিত করিয়া তাহাকে শিমোনোসেকির সন্ধি (১৮৯৫) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা জাপানের অসাধারণ সাফল্যের নিদর্শন। ইহার ফলে জাপানের

মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল, শুল্ক ব্যবস্থার উপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের অবসান হইল এবং জাপানে অবস্থানকারী বৈদেশিক নাগরিকদের বিশেষ স্থযোগ স্থবিধা প্রত্যাহার করা হইল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যে দূর প্রাচ্যের রাজনীতিতে জটিলতার স্থষ্টি হইল। চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় শক্তিগুলি দ্বিগুণ উৎসাহে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানীর সমর্থনে জাপানকে শিমোনোসেকির সন্ধির সর্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিল। রাশিয়ার হস্তক্ষেপে জাপান ক্রুদ্ধ হইল। রাশিয়ার ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিবার জন্য জাপান স্থযোগ খুঁজিতে লাগিল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪) : চীন-জাপান যুদ্ধের সময় রাশিয়া চীনের বন্ধু সাজিয়া জাপানের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল। অতঃপর রাশিয়া লিয়াও তুং উপদ্বীপ চীনের নিকট হইতে ইজারা লইয়া পোর্টআর্থারে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল এবং চীনের সম্মতিক্রমে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণ করিয়াছিল। ফলে মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কোরিয়ায় জাপানের স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছিল। স্থতরাং কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থষ্টি হইল। মাঞ্চুরিয়া হইতে রাশিয়াকে বিতাড়িত করিবার জন্য জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। চীনে রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধির ফলে ইংরেজ স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছিল। রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হইল (১৯০২)। ইহার সর্ত অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে একটি রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলে অপর রাষ্ট্র তাহাকে সাহায্য করিবে। এমন কি ইহাদের মধ্যে একটি রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে অপর রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিবে এবং অন্য কোন শক্তির হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করিবে। এই চুক্তির ফলে জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রী স্থাপনের শক্তি বৃদ্ধি হইল।

রুশ-জাপান বিরোধ

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী স্থাপনে রাশিয়া শংকিত হইয়াছিল ; জাপানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। রাশিয়া সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য চীনের নিকট মাঞ্চুরিয়া হইতে তাহার (রাশিয়ার) সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব করিল। কিন্তু কার্যতঃ বিভিন্ন অজুহাতে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিল না। জাপান, চীন ও কোরিয়ায় রাশিয়া আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের এবং মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগের দাবী করিল। কিন্তু রাশিয়া এই দাবী মানিয়া লইতে অসম্মত হওয়ায় জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

জলে, স্থলে সর্বত্র রাশিয়া পরাজিত হইল। মুকডেনের যুদ্ধে রুশ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। অ্যাডমিরাল তোগো রাশিয়ার বাল্টিক নৌবহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করিলেন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয়পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় পোর্টস মাউথের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান হইল। রাশিয়া, কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য মানিয়া লইল ; মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগে সম্মত হইল ; সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং লিয়াও তুং উপদ্বীপের ইজারা অধিকার জাপানকে অর্পণ করিল। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এশিয়ার একটি শক্তির নিকট ইউরোপীয় শক্তির পরাজয়। জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি ও সাফল্যের ফলে চীন পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে অধিকতর উৎসাহী হইল। জাপানের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত ইংলণ্ড ১৯০৭ খৃঃ রাশিয়ার সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল।

পোর্টস্ মাউথের সন্ধি ; ফলাফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান : রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লালসা বাড়িয়া গেল। ১৯১০ খৃঃ জাপান সরাসরি কোরিয়া অধিকার করিয়া লইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্র রাষ্ট্ররূপে জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনে জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করিয়া লইল। ১৯১৫ খৃঃ জাপান চীনের নিকট একুশ দফা দাবী সমন্বিত এক চরমপত্র পেশ করিল। চীন এই দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জাপান চীনের

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার পাইল। ইউরোপের শক্তিবর্গ এবং আমেরিকা ভার্সাই সন্ধিতে জাপানের নূতন সাম্রাজ্যবাদ স্বীকার করিয়া লইল।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৮৪০ প্রথম আফিং যুদ্ধ।
১৮৪২ নানকিং এর সন্ধি।
১৮৫৬-৫৮ দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধ।
১৮৫৮ তিয়েনসিনের সন্ধি।
১৮৫১-৬৪ তাইপিং বিদ্রোহ।
১৮৬৮-১৯০০ জাপানের পুনর্গঠন।
১৮৯৪-৯৫ চীন-জাপান যুদ্ধ।
১৮৯৫ শিমোনোসেকির সন্ধি।
১৯০০ বক্সার বিদ্রোহ।
১৯০১ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী।
১৯০৪-৫ রুশ-জাপান যুদ্ধ।
১৯০৫ পোর্টস মাউথের সন্ধি।
১৯১০ জাপানের কোরিয়া অধিকার।
১৯১২ চীন বিপ্লব ; মাঞ্চুবংশের পতন ; রাষ্ট্রপতি সান-ইয়াৎ সেন।
১৯১৪ জাপানের বিশ্বযুদ্ধে যোগদান।
১৯১৫ জাপানের একুশ দফা দাবী।
১৯১৭ চীনের বিশ্বযুদ্ধে যোগদান।
১৯২১-২২ ওয়াশিংটন বৈঠক।

প্রশ্নাবলী

1. Write what you know about the two Opium wars.
   দুইটি আফিং যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
2. Briefly describe the history of the penetration of European powers in China.
   চীনে ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রবেশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

3. Narrate the history of China from the treaty of Shimonoseki to the Chinese revolution of 1912.
   শিমোনোসেকির সন্ধি হইতে ১৯১২ খৃঃ বিপ্লব পর্যন্ত চীনের ইতিহাস বর্ণনা কর।
4. Make an estimate of Dr. San-Yat-Sen and his contritution to the growth of Chinese Nationalism.
   ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কৃতিত্ব এবং চীনের জাতীয়তাবাদের বিকাশে তাহার অবদান আলোচনা কর।
5. Describe the causes and Consequences of the Sino-Japanese war.
   চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
6. Describe the causes and consequences of the Russo-Japanese war.
   রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস ও ফলাফল আলোচনা কর।
7. Briefly describe the reconstruction of Japan from 1868-1900.
   ১৮৬৮ খৃঃ হইতে ১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত জাপানের পুনর্গঠন আলোচনা কর।
8. Describe the rise of Japanese imperialism up to the First World War.
   প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় আলোচনা কর।
9. Write notes on : Hundred days of Reform, Restoration of the Meiji, Boxer Rebellion.
   টীকা লিখ :—শতদিনের সংস্কার ; মেইজির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; বক্সার বিদ্রোহ।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)

বিশ্বযুদ্ধের পথে ইউরোপ : ১৯১৪ খৃঃ বিশ্বব্যাপী যে প্রলয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহার পটভূমি রচিত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃঃ ফ্রাংকো-প্রাশিয়া যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। পরাজিত ফ্রান্স মিত্রহীন এবং নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু বিসমার্কের ভয় হইয়াছিল হয়ত ফ্রান্স প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে। এইজন্য ১৮৮২ খৃঃ তিনি জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীকে লইয়া ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন করিলেন। ফ্রান্স শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ত্রিশক্তি মৈত্রীতে ভীত ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত দ্বিশক্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিল (১৮৯১)। ইউরোপ পরস্পর বিরোধী দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। বিসমার্ক যতদিন ক্ষমতায় ইউরোপ অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন ইউরোপে শান্তি অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮৯০ খৃঃ বিসমার্কের পতনের পর সম্রাট কাইজার উইলিয়ামের নেতৃত্বে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী লালসা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া উঠিল। কাইজার বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিলেন। নেপোলিয়ানের পতনের পর হইতে ইংলণ্ড ইউরোপের ঘটনাবলী হইতে দূরে না থাকিলেও কোন রাষ্ট্রের মৈত্রী বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে নাই। কিন্তু ইউরোপ দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলে নিঃসঙ্গ থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। মধ্য প্রাচ্যে ও এশিয়ার রুশভীতি এবং আফ্রিকায় ফরাসী ভীতির ফলে ইংলণ্ড ত্রিশক্তি মৈত্রীতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু বুয়র যুদ্ধে জার্মানীর ইংলণ্ড বিরোধী নীতিতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তদুপরি কাইজার উইলিয়াম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে জার্মানীর ভবিষ্যৎ 'সমুদ্রে নিহিত'—এবং ইংলণ্ডের নৌবহরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শক্তিশালী নৌবহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃঃ মধ্যে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিবাদ মীমাংসা করিয়া লইল। এই তিন শক্তি লইয়া গঠিত হইল ত্রিশক্তি

দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোট

আঁতাত। ১৯০২ খৃঃ জাপানের সহিত ইংলণ্ড মৈত্রী চুক্তি করিল। জার্মানীর ভয় হইল ইংলণ্ড তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ১৯০৪ খৃঃ ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি অনুযায়ী ইংলণ্ড স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র মরোক্কোয় ফ্রান্সের রাজনৈতিক আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানী এই চুক্তি মানিতে অস্বীকার করিল। ১৯০৫ খৃঃ কাইজার মরোক্কোয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৯০৬ খৃঃ এবং ১৯০৯ খৃঃ দুইবার মরক্কো প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়। কিন্তু ১৯১১ খৃঃ মরোক্কোয় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে জার্মানী মরোক্কোর বন্দর আগাদির'এ একখানি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করিল। জার্মানীর এই উদ্ধত কার্যের প্রতিবাদে ইংলণ্ড ফ্রান্সের সমর্থনের জন্য একখানি ক্রুজার প্রেরণ

মরক্কো সমস্যা
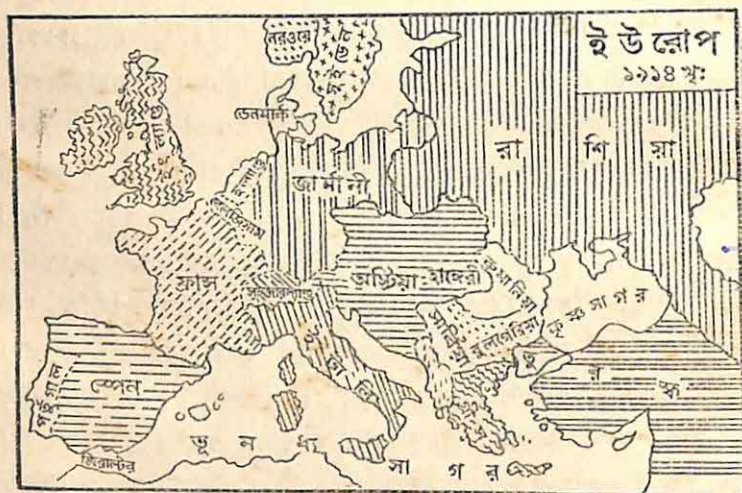
করিল। শেষপর্যন্ত কাইজার শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় রাজী হইলেন। কিন্তু বলকান অঞ্চলে রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ছিল। ১৯০৮ খৃঃ অষ্ট্রিয়া বার্লিন সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়া বসনিয়া এবং হারজিগোভিনা সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল। সার্ব অধ্যুষিত এই দুই রাজ্য অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করায় সার্বিয়া এবং রাশিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানী অষ্ট্রিয়ার কার্য সমর্থন করিল। অষ্ট্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল সার্বিয়াকে ধ্বংস করা। ১৯১২-১৩ খৃঃ অষ্ট্রিয়া

সার্বিয়াকে কয়েকটি অঞ্চল পরিত্যাগে বাধ্য করে এবং সমুদ্রের সান্নিধ্য হইতে সার্বিয়াকে দূরে রাখিবার জন্য স্বাধীন আলবেনিয়া রাজ্যের সৃষ্টি করিল। এমনকি অষ্ট্রিয়া সরাসরি সার্বিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মিত্ররাষ্ট্র ইটালীর বাধাদানে তাহা সম্ভব হয় নাই। রাশিয়াও অষ্ট্রিয়ার কার্যে বাধাদানের জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া বিরোধ পনেরো মাসের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ১৯১৩ খৃঃ জার্মানীর সৈন্য সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষে পরিণত হইয়াছিল। ফ্রান্সও দ্রুত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। রাশিয়ার সামরিক প্রস্তুতিও দ্রুত চলিতেছিল, সুতরাং ইউরোপ বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃঃ ইউরোপের শক্তিগুলির সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া বিরোধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ (১) বিশ্বযুদ্ধের প্রথম কারণ হইল বিশ্বশক্তিতে পরিণত হইবার জন্য জার্মানীর উচ্চাশা। জার্মান জাতীয়তাবাদ নগ্ন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানী দ্রুত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃঃ মধ্যে বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলি ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং জার্মানী যে দিকেই সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল, সেই দিকেই সে বাধাপ্রাপ্ত হইল। সুতরাং তাহার সাম্রাজ্যবাদী লালসা অচরিতার্থ রহিয়া গেল। বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জার্মানী ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইল। (২) যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ হইল জার্মান জঙ্গীবাদের আবির্ভাব। জার্মানী উপলব্ধি করিল যুদ্ধ ব্যতীত জার্মানীকে একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত করা যাইবে না। ১৯১৩ খৃঃ মধ্যে জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় নয়লক্ষ হইল। জার্মানীতে প্রচার করা হইল যুদ্ধ জাতির শক্তির ও বীর্যের পরিচয়। কিন্তু জার্মানী যখন শক্তিশালী নৌবহর গঠন করিল তখন ইংলণ্ড ভীত হইল। কারণ জার্মান নৌবহরের অভ্যুদয়ে তাহার নৌশক্তি বিপদগ্রস্থ হইয়াছিল। ভীত ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত ত্রিশক্তি

জার্মানীর উচ্চাশা

জার্মান জঙ্গীবাদ ; ইংলণ্ড ও জার্মান নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আঁতাত গঠন করিল। (৩) ত্রি-শক্তি আঁতাত গঠিত হইবার পর সর্বশ্রেষ্ঠ নৌশক্তির সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থলশক্তির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। জার্মানীর ভয় হইয়াছিল ইংলণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিতে চাহে। জার্মানীর ধারণা হইল ইংলণ্ড তাহার প্রধানতম শত্রু। (৪) জার্মানীর নিকট-প্রাচ্য নীতি যুদ্ধের আর একটি কারণ। তুরস্কে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল এবং জার্মানী মিত্ররাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ার বলকান নীতি সমর্থন করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়ার বিরোধে জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পিছনে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। জার্মানীর বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনায় ইংলণ্ড ভীত এবং ত্রস্ত হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার আক্রমাত্মক বলকান নীতি জার্মানীর পরিকল্পিত বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে, এইজন্য জার্মানী অষ্ট্রিয়ার উগ্র কার্যকলাপ সমর্থন করিয়াছিল। জার্মানীর সমর্থনে নিশ্চিত হইয়া অষ্ট্রিয়া যে সার্বিয়া বিরোধী নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই শেষপর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের কারণ হইয়াছিল। (৫) অষ্ট্রিয়া সুস্পষ্টভাবে সার্বিয়াকে ধ্বংস করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়ার ধারণা হইয়াছিল সার্বিয়া শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইলে অষ্ট্রিয়ার অধীন বহুসংখ্যক সার্ব অধিবাসী সার্বিয়ার সহিত যোগদানের জন্য বিদ্রোহী হইতে পারে। ১৯০৮ খৃঃ বার্লিন সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়া অষ্ট্রিয়া বসনিয়া এবং হারজিগোভিনা অধিকার করিয়াছিল এবং সার্বিয়ার শক্তি-বৃদ্ধিতে বাধাদানের জন্য আলবেনিয়া রাজ্য গঠন করিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া বারংবার সার্বিয়াকে অপমানজনক দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিল। সুতরাং অষ্ট্রিয়ার সার্বিয়া নীতি বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। (৬) ইউরোপ যখন এইরূপ একটি বারুদস্তূপে পরিণত হইয়াছিল তখন একটি ঘটনা এই বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করিল। ১৯১৭ খৃঃ ১৮শে জুন অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রান্সিস ও তাহার স্ত্রী বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ক্রুদ্ধ অষ্ট্রিয়া

জার্মানীর পরিবেষ্টিত হইবার ভয়

জার্মানীর বলকান ও নিকট-প্রাচ্য নীতি

অস্ট্রিয়ার সার্বিয়া নীতি

সার্বদের হত্যাকারী জাতি বলিয়া অভিহিত করিল। বসনিয়া পূর্বেই অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দুর্ঘটনাটি অষ্ট্রিয়ার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হত্যাকারীরা ছিল অষ্ট্রিয়ার প্রজা। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ইহার জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করিল। অষ্ট্রিয়া ঘোষণা করিল সার্বিয়ার অষ্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্যের ফলেই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হত্যার একমাস পরে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার নিকট কতকগুলি অপমানজনক দাবী সমন্বিত এক চরমপত্র প্রেরণ করিল। এই দাবীগুলি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণের দাবী জানান হইল। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড সময় বৃদ্ধির জন্য অষ্ট্রিয়াকে অনুরোধ করিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। সার্বিয়া চরমপত্রের অনেকগুলি সর্ত মানিয়া লইল—অন্যগুলি মানিয়া লইলে সার্বিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইত। এইজন্য সার্বিয়া সমগ্র বিষয়টি হেগ ট্রাইবুনাল বা বৃহৎশক্তি সম্মেলনে পেশ করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

আর্চডিউক ফ্রান্সিসের হত্যাকাণ্ড

যুদ্ধ আরম্ভ ঃ রাশিয়া সার্বিয়ার বিপদে নিশ্চেষ্ট রহিল না। জার ঘোষনা করিলেন, বলকান সমস্যা ইউরোপের সমস্যা, সুতরাং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মেলনে ইহার সমাধান করিতে হইবে। কিন্তু অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সমর্থনে ঘোষনা করিল অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়ার বিরোধে কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই। রাশিয়ার দাবী অষ্ট্রিয়া অগ্রাহ্য করার ফলে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও জার্মান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিল। ১৯১৪ খৃঃ ১লা আগষ্ট জার্মানী রাশিয়ার নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং ৩রা আগষ্ট জার্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ঐ দিনই ইটালী, অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র হইলেও নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। ৪ঠা আগষ্ট জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করিলে আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতি ভঙ্গের অভিযোগে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিল। পূর্বে এক আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা জার্মানীসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল।

যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী ঃ যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বেলজিয়াম অধিকার করিয়া, বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎগতিতে ফ্রান্সে প্রবেশ করিল। আলসেস লোরেণ হইতে ফরাসী বাহিনী বিতাড়িত করিয়া জার্মান বাহিনী প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু ফরাসী সেনাপতি ফচ্ মার্ণনদীর যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর গতিরোধ করিলেন। ঝটিকা গতিতে ফ্রান্স অধিকার করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হইল না। এদিকে ট্যানেনবার্গের যুদ্ধে হিণ্ডেনবার্গ রুশ বাহিনীকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর রুশবাহিনী গ্যালিসিয়া এবং কার্পাথিয়া অধিকার করিয়া হাঙ্গেরী অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু জার্মান বাহিনী রুশ বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া গ্যালিসিয়া পুনরধিকার করিল এবং ওরারশ অধিকার করিল।

১৯১৪

১৯১৫ খৃঃ ইটালী জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিল এবং তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়া জার্মানীর সহিত যোগদান করিল। ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যবাহিনীর দার্দানেলিস এবং গ্যালিপলি অধিকারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইল। ঐ বৎসরই অষ্ট্রিয়া-জার্মান বাহিনী সার্বিয়া অধিকার করিয়া লইল। মেসোপটেমিয়ায় ব্রিটিশ অভিযান ব্যর্থ হইল এবং কূট-এল-আমারা'র যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তুর্কীবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

১৯১৫

১৯১৬ খৃঃ সূচনায় রণদুর্মদ জার্মানবাহিনী প্রচণ্ডবেগে ভার্দুন আক্রমণ করিল, কিন্তু ফরাসীবাহিনী অসীম বীরত্বের সহিত জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিল। এদিকে সোম অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখেও জার্মান বাহিনী অচল, অটল রহিল। পূর্বদিকে রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও বিতাড়িত করিল। ইটালীও একই সময় জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিল। রুমানিয়া রাশিয়ার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়া-জার্মান বাহিনী রুমানিয়া অধিকার করিল।

১৯১৬

এদিকে সমুদ্রে ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে নৌ-যুদ্ধ চলিতেছিল।

জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধে (১৯১৬) উভয়পক্ষে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হইল। কোন পক্ষই চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকায় মিত্রপক্ষের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ প্রেরণের কোন অসুবিধা হয় নাই।

১৯১৭ খৃঃ রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে জার শাসনের পতন হইল। রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা বলশেভিকদের হস্তগত হইল। ১৯১৮ খৃঃ রাশিয়া ব্রেষ্ট-লিটোভস্কের সন্ধি দ্বারা জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করিল। এই সন্ধির সর্ত অনুযায়ী রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং বাল্টিক অঞ্চলসহ সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ জার্মানীকে ছাড়িয়া দিল। জার্মানী পূর্ব সীমান্ত হইতে বিরাট সৈন্যবাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রেরণ করিল। মিত্রপক্ষের অবস্থা সংকটজনক হইয়া উঠিল। কিন্তু জার্মানীর বেপরোয়া সাবমেরিণ যুদ্ধের প্রতিবাদে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিল।

১৯১৭

১৯১৮ খৃঃ সূচনায় জার্মানী পশ্চিম রণাঙ্গনে বারংবার মিত্র বাহিনীকে আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু মিত্র বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে জার্মান বাহিনী সমস্ত শক্তি সমাবেশ করিয়া অগ্রসর হইল এবং প্যারিসের চল্লিশ মাইলের মধ্যে উপনীত হইল। এই সংকটের সম্মুখে পড়িয়া মিত্রপক্ষ ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ফচকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিল। মার্শাল ফচ্ মার্ণ হইতে এবং ইংরেজ বাহিনী আমিয়েনস হইতে জার্মানদের বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর জেনারেল হেইগ হিণ্ডেনবার্গ লাইন ধ্বংস করিলেন। সর্বত্র জার্মানীর পরাজয় হইতে লাগিল। সিরিয়ায় তুর্কী বাহিনী পরাজিত হইল; বুলগেরিয়া ও অষ্ট্রিয়া আত্মসমর্পণ করিল। পরাজিত ও বিধ্বস্ত জার্মানী শান্তির প্রস্তাব করিল।

১৯১৮

জার্মানীর পরাজয়

ইতিমধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শান্তি স্থাপনের ভিত্তি হিসাবে চৌদ্দ দফা সর্তের উল্লেখ করেন। ইহার উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি হইল লীগ অব নেশনস্ প্রতিষ্ঠা করা, সকল জাতির

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা, সমুদ্রে সকল জাতির অবাধ অধিকার স্বীকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ইত্যাদি। এই চৌদ্দ দফা ধারার কিছু পরিবর্তন করিয়া ইহার ভিত্তিতে জার্মানীর সহিত শান্তিস্থাপন করা হইল। মিত্রপক্ষের দাবী স্বীকার করিয়া জার্মানী যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিল (১১ই নভেম্বর, ১৯১৮)। এই সময় জার্মান নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হইল। কাইজার হল্যাণ্ডে পলায়ন করিলেন। জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। চারি বৎসরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হইল।

উইলসনের চৌদ্দ দফা

কাইজার উইলিয়াম

মহাযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য : প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল মানুষের মারণযজ্ঞ। বিশ্বব্যাপী এই ধরণের রক্তক্ষয়ী এবং ভয়াবহ সংগ্রাম আর হয় নাই। সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। জলে, স্থলে আকাশে সর্বত্র এই ধ্বংসলীলা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কোন মহাদেশ ও মহাসমুদ্র রক্ষা পায় নাই। সাবমেরিণ, বিষাক্ত গ্যাস, জেপেলিন, বোমা, ট্যাংক, টর্পেডো, দূরপাল্লার কামান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়া এই প্রলয়ংকর ধ্বংসলীলার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯) : মিত্র রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ শান্তির সর্ত স্থির করিবার জন্য প্যারিসে সমবেত হইলেন। ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের ক্লিমেন্স্যু, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন এবং ইটালীর অর্লাণ্ডো এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই 'বৃহৎ চারিজন' কয়েকমাস ধরিয়া আলোচনার পর শান্তির সর্ত নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রপতি উইলসন ছিলেন আদর্শবাদী। তাহারই প্রচেষ্টায় লীগ অব নেশনস্

গঠনের প্রস্তাব এবং জার্মানীর উপনিবেশগুলি ও তুরস্কের প্রদেশগুলি লীগ অব নেশন'স্' অধীনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট নির্দিষ্টকালের জন্য শাসনভার অর্পণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) ভার্সাই সন্ধিঃ ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করা হইল। মিত্রপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী জার্মান প্রতিনিধি এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। ইহার সর্ত অনুযায়ী জার্মানী আলসেস-লোরেন অঞ্চল

ভার্সাই সন্ধির পরে ইউরোপ
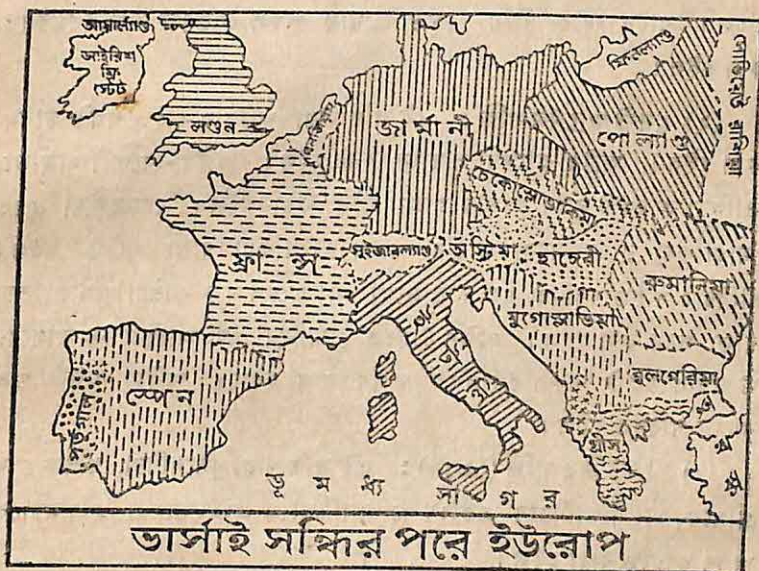
ফ্রান্সকে অর্পণ করিল এবং পনেরো বৎসরের জন্য কয়লাখনি অধ্যুষিত সার অঞ্চল ফ্রান্সের হস্তে অর্পণে স্বীকৃত হইল। পনেরো বৎসর পর গণভোটের দ্বারা এই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। বেলজিয়াম জার্মানীর কয়েকটি অঞ্চল পাইল; মেমেল সহর লিথুনিয়াকে প্রদান করা হইল এবং উত্তর শ্লেসুইগ ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত হইল। জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত পোল্যাণ্ড অঞ্চল নবগঠিত পোল্যাণ্ড রাজ্যের সহিত যুক্ত করা হইল। ডানজিগ্ আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হইল এবং ডানজিগ্ সহর লীগ অব নেশনস্‌এর অধীনে সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত করা হইল। সাইলেশিয়ার অধিকাংশ পোল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত

হইল। পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিল। জার্মানী, চীন ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলি পরিত্যাগ করিল। এই উপনিবেশগুলির শাসনভার লীগ অব নেশনসএর অধীনে এক একটি রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করা হইল। ইহাই ম্যাণ্ডেটরী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া এক লক্ষ করা হইল; অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ করা হইল। জার্মান নৌবহর ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করা হইল; জার্মানীর হস্তে মাত্র কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ রহিল। রাইন নদীর তীরে বিস্তৃত জার্মান অঞ্চল সৈন্যমুক্ত অঞ্চলে পরিণত করা হইল।

(২) সেণ্ট জার্মেন সন্ধি: এই সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি স্থাপন করা হইল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কয়েকটি নূতন জাতীয় রাজ্য গঠন করা হইল। বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া রাজ্য লইয়া স্বাধীন চেকোশ্লাভাকিয়া রাজ্য গঠিত হইল। সার্বিয়ার সহিত বসনিয়া এবং হারজিগোভিনা প্রদেশ যুক্ত করিয়া যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য গঠন করা হইল। দক্ষিণ টাইরল, ট্রেনটিনো এবং আড্রিয়াটিক সাগরের উত্তরে কয়েকটি অঞ্চল ইটালীকে অর্পণ করা হইল। অষ্ট্রিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইল।

(৩) **নিউলির সন্ধি (১৯১৯):** এই সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়া, পশ্চিম থ্রেস গ্রীসকে, ম্যাসিডোনিয়ার একাংশ যুগোশ্লাভিয়াকে এবং ডেব্রুজা রুমানিয়াকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

(৪) **ট্রিয়াননের সন্ধি (১৯২০):** এই সন্ধি দ্বারা হাঙ্গেরী, রুমানিয়াকে ট্রান্সসিলভানিয়া এবং চেকোশ্লাভাকিয়াকে শ্লোভাকিয়া অর্পণ করিতে বাধ্য হইল। হাঙ্গেরীর আর একটি অঞ্চল ক্রোসিয়া যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল।

(৫) **সেভার্সের সন্ধি (১৯২০):** এই সন্ধির ফলে তুরস্ক আফ্রিকার প্রদেশগুলি, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং আরব'এর উপর সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করিল। গ্রীসকে পূর্ব থ্রেস, স্মার্ণা এবং এশিয়া মাইনরের সন্নিহিত অঞ্চল অর্পণ করা হইল। আর্মেনিয়াকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইল। ডার্ডানেলিস এবং বসফরাস সকল

জাতির জন্য উন্মুক্ত হইল। কনষ্টান্টিনোপল এবং আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত বিরাট তুর্কী সাম্রাজ্যের আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা ঃ ভার্সাই এবং অন্যান্য সন্ধির সর্তাবলী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রনায়কগণ প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া চেকোশ্লাভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল। দুর্ভাগা পোল্যাণ্ডকে পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু নবগঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণ থাকিয়া গিয়াছিল। ইউরোপের বাহিরে জার্মাণীর উপনিবেশ এবং তুরস্কের প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রনের নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই। ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা দ্বারা এই সকল অঞ্চলের শাসনভার বৃহৎ শক্তিগুলির উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। অনুন্নত দেশগুলির স্বাধীনতার আকাংখাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। শান্তি সম্মেলনে দুইটি পরস্পর বিরোধী নীতির সংঘাত হইয়াছিল। একদিকে ছিল রাষ্ট্রপতি উইলসনের আদর্শবাদী নীতি ; এই নীতি অনুযায়ী তিনি চৌদ্দ দফা পরিকল্পনা (Fourteenpoints) উপস্থিত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে ছিল বিজয়ী শক্তিগুলির স্বার্থপর এবং প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। শান্তি সম্মেলনের বহুপূর্বেই তাহারা গোপন চুক্তি দ্বারা পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। পরাজিত রাষ্ট্রগুলির উপর প্রতিশোধ গ্রহাণের উদ্দেশ্য লইয়াই তাহারা শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছিল ; অষ্ট্রিয়া পর্তুগাল অপেক্ষাও আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াছিল ; জার্মাণীর উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদানের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরাজিত জাতিগুলির অধীন অঞ্চলে আত্ম-নিয়ন্ত্রনের দাবী অনুযায়ী জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অধীন জাতিগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করে নাই।

ত্রুটি বিচ্যুতি

বলা হইয়াছে ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই আর একটি বিশ্বযুদ্ধের বীজ

নিহিত ছিল। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ পরাজিত রাষ্ট্রগুলির উপর অপমানকর সন্ধির সর্ত চাপাইয়া দিয়াছিলেন। জার্মাণীর ন্যায় রাষ্ট্রের উপর এমন কতকগুলি সর্ত চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহা অত্যন্ত অন্যায় এবং অপমানকর ছিল। শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবর্গের কোন আন্তরিকতা বা সহানুভূতি ছিল না। জার্মাণীকে পদানত এবং চূর্ণ করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জার্মাণীর উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইল; ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল জার্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল; পর্বতপ্রমান ক্ষতিপূরণের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইল; সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া একলক্ষ করা হইল এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ করা হইল। এই ধরণের অন্যায় এবং অপমানকর সর্তাবলী জার্মাণীর ন্যায় শক্তিশালী জাতির পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। নিরুপায় জার্মানি জাতি এই অবিচার এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিন গুণিতে লাগিল। জার্মান জাতির এই ক্রোধ এবং ক্ষোভের মধ্য হইতে নাৎসীবাদ ও হিটলারের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

আর একটি বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত

মুস্তাফা কামাল ও নব্য তুরস্ক: ১৯২০ খৃঃ সেভার্সের সন্ধি দ্বারা তুরস্ককে চূড়ান্তভাবে অপমান করা হইয়াছিল। জার্মানীর সহিত যোগদানের শাস্তি স্বরূপ তুরস্কের নিকট হইতে বিস্তৃত অঞ্চল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। তুরস্ক কনষ্টান্টিনোপল এবং আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চল লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তুরস্কের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা এবং অবিচারের ফলে তুরস্কের তরুণদের মনে গভীর ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। অপমান এবং অবিচারের শৃংখল ভাঙ্গিয়া জাতির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তাহারা শপথ গ্রহণ করিল। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তাহারা সেভার্সের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া নূতন তুরস্ক গঠনে অগ্রসর হইল।

সেভার্সের সন্ধির পর তুরস্ক

১৮৮০ খৃঃ কামালের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন এবং নব্য তুর্কী দলের (Young Turk) সংস্পর্শে আসেন। সুলতানের

স্বৈরাচারী শাসন তিনি কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। নব্য তুর্কী দলের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি উন্নত সামরিক শিক্ষার জন্য ১৯১০ খৃঃ ফ্রান্সে গমন করেন। ১৯১২-১৩ খৃঃ বলকান যুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯১৫ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপোলি'তে ব্রিটিশ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। স্থলতানের কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি প্যালেষ্টাইনের সৈন্য বাহিনীর অধিনায়কত্ব ত্যাগ করিয়া কনষ্টান্টিনোপল'এ প্রত্যাবর্তন করেন। স্থলতান কামালের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তাহাকে নূতন পদে নিযুক্ত করিয়া আনাতোলিয়ায় প্রেরণ করেন। এখানে

কামালের প্রথম জীবন

তিনি দেশভক্ত সৈন্যদলকে স্থগঠিত করিতে থাকেন এবং পিপলস্ পার্টি নামে জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। অল্পকালের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী দল পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের দমন করিবার জন্য একটি ব্রিটিশ বাহিনী কনষ্টান্টিনোপলএ উপস্থিত হইয়া সামরিক আইন জারী করিল এবং প্রায় চল্লিশ জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিল। ক্রুদ্ধ কামাল ১৯২০ খৃঃ আংকারায় জাতীয় মহাসভা আহ্বান করিলেন এবং ইহাকে তুর্কী জাতির একমাত্র প্রতিনিধি সভা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাতীয় মহাসভা কামালকে রাষ্ট্রপতি ও সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করিল। একদিকে রহিল কনষ্টান্টিনোপলে স্থলতানের নেতৃত্বে তুর্কী সরকার; অন্যদিকে আংকারায় কামাল প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন করিয়া জাতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন।

কামাল আতাতুর্ক

কামাল দক্ষিণ আনাতোলিয়া হইতে ইটালীর সৈন্যদল এবং সিলিসিয়া হইতে ফরাসী সৈন্যদল বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর তিনি সোভিয়েত

রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। ইহার পরই কামাল নবগঠিত আর্মেনীয় প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিলেন। সেভার্সের সন্ধি দ্বারা গ্রীস তুরস্কে অনেক সুযোগ সুবিধা পাইয়াছিল। এই সকল সর্ত আদায় করিবার জন্য এবং কামালের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন দমন করিবার জন্য গ্রীক সৈন্যদল থ্রেস হইতে তুর্কী সৈন্যদল বিতাড়িত করিল এবং স্মার্ণা নামক স্থানে অবতরণ করিল। নূতন করিয়া অপমানে আহত ও ক্ষুব্ধ তুর্কী জাতি কামালের পতাকাতলে সমবেত হইল। ব্রিটিশ সরকারের নৈতিক এবং আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট গ্রীকবাহিনী আংকারা অভিমুখে অগ্রসর হইল। জাতীয় বাহিনীকে ক্রমাগত পরাজিত করিয়া গ্রীকগণ সাখারিয়া নদীর তীরে উপনীত হইল। মুস্তাফা কামাল এইবার স্বয়ং সৈন্য বাহিনীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে রহিলেন তাহার বিশ্বস্ত সহচর ইসমেত ইনোনু। অতঃপর সাখারিয়ায় তিন সপ্তাহ ব্যাপী এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইল। তীব্র, কঠোর এবং হাতাহাতি সংগ্রামের পর গ্রীক সৈন্যদল পরাজিত হইল। অতঃপর তুর্কী বাহিনী পশ্চাদপসরণকারী গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। গ্রীকগণ এশিয়া মাইনর হইতে বিতাড়িত হইল। কামাল স্মার্ণা অধিকার করিলেন। বিজয়োল্লাসে মত্ত কামাল থ্রেস অধিকারে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ রণতরী-সমূহ তাহাকে বাধাদান করিল। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত ১৯২২ খৃঃ যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ঐ বৎসরই তুর্কীর জাতীয় মহাসভা সুলতানের পদ বিলুপ্ত করিল। সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজে করিয়া মাল্টায় পলায়ন করিলেন। পর বৎসর (২৯শে অক্টোবর ১৯২৩) তুরস্কে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হইল। নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন কামাল। জাতি তাহাকে জাতির পিতা বা আতাতুর্ক বলিয়া অভিনন্দিত করিল।

মুক্তিসংগ্রাম

সাখারিয়ার যুদ্ধ

গ্রীকগণ বিতাড়িত

তুরস্কে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

অতঃপর ১৯২৩ খৃঃ লুসানের সন্ধি দ্বারা মিত্রপক্ষ সেভার্সের সন্ধির সর্ত পরিবর্তন করিল এবং কামালের নেতৃত্বে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইল।

আড্রিয়ানোপল সহর সহ পূর্ব থ্রেস তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কনষ্টান্টিনোপলও তুরস্কের হস্তে অর্পণ করা হইল। তুরস্কের শুল্ক ব্যবস্থার উপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইল; সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হইল। তুরস্ক, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় তাহার প্রদেশগুলির উপর দাবী পরিত্যাগ করিল এবং তুরস্ক ও ইউরোপের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জলরেখা সৈন্যমুক্ত অঞ্চলে পরিণত হইতে স্বীকৃত হইল। লুসানের সন্ধি কামালের বিরাট সাফল্যের পরিচয়।

লুসানের সন্ধি

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল। একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হইল। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া জাতীয় মহাসভা গঠনের ব্যবস্থা হইল। এই মহাসভা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিবে। কিন্তু দেশে একটিমাত্র সুগঠিত দল রহিল, কামালের পিপলস্ পার্টি। ইহার প্রতিনিধিগণ জাতীয় মহাসভায় নির্বাচিত হইত। কামাল হইলেন রাষ্ট্রপতি এবং সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক; কার্যতঃ তুরস্কের ডিক্টেটর।

রাষ্ট্রপতি কামাল

কামালের সংস্কারঃ তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য কামাল ব্যাপক সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তুরস্ককে পুনর্গঠন করা হইল। কনষ্টান্টিনোপলের নাম রাখা হইল ইস্তাম্বুল। কনষ্টান্টি-নোপলের পরিবর্তে আংকারায় রাজধানী স্থাপন করা হইল। তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। ১৯২৪ খৃঃ খলিফার পদ বিলুপ্ত করা হইল। শরিয়তের আইন অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া পাশ্চাত্য ধরণের আইন কানুন প্রবর্তন করা হইল। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। বিবাহ পদ্ধতি পরিবর্তন করা হইল। স্ত্রী স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। নারীদের পুরুষের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইল। ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্তন করা হইল। শিক্ষার প্রসারের জন্য কামাল বহু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। চল্লিশ বৎসরের অনুর্ধ সকল তুর্কীকে লেখাপড়া শিখিবার নির্দেশ প্রদান করা হইল। আরবীর

পরিবর্তে ল্যাটিন হরপ প্রবর্তন করা হইল। আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইল। কৃষকদের বিভিন্ন সাহায্য প্রদান করা হইল। কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য কৃষি কলেজ এবং কৃষকদের ঋনদানের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করা হইল। ১৯২৯ খৃঃ দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য দ্বাদশ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। বহু নূতন রেলপথ, বন্দর, পোতাশ্রয় নির্মিত হইল এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইল। বহু কলকারখানা স্থাপন করা হইল। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তুরস্কের রূপান্তর ঘটিয়া গেল। তুরস্ক একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত কামালের পূর্ব হইতে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯২৫ খৃঃ রাশিয়ার সহিত তুরস্কের পারস্পরিক নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রাশিয়ার সহিত মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তুরস্ক পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির দিকে ঝুঁকিতে থাকে। ১৯৩২ খৃঃ তুরস্ক 'লীগ অব নেশনস্'এ যোগদান করে। অতঃপর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৩৪ খৃঃ তুরস্ক, গ্রীস রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার সহিত বলকান চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহার পরই তুরস্ক, ইরাক, ইরান এবং আফগানিস্থানকে লইয়া প্রাচ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তুরস্কের শান্তিপূর্ণ নীতিতে সন্তুষ্ট হইয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইউরোপ ও তুরস্কের মধ্যবর্তী প্রণালীতে (Straits) সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে।

কামালকে তুর্কীজাতির পিতা (Father of the Turks) বলা হয়। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে পরাজিত, অপমানিত, পঙ্গু ও জরাজীর্ণ রাষ্ট্রকে একটি সুগঠিত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করা তাহার অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয়। তুরস্ক আর 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' নহে, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, আধুনিক পৃথিবীর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। ১৯৩৮ খৃঃ আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আরব জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ঃ আরব জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৪ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিশরকে তুরস্কের অধীনতা মুক্ত করিয়া ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে (Protectorate) আনয়ন করা হয়। তুরস্কের শাসনমুক্ত মিশরের জনসাধারণ ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব পছন্দ করে নাই। মিশরকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। মিশরে জাতীয় আন্দোলনের জনক হইলেন আরবী পাশা। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরবীপাশা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই (১৮৮২)। অতঃপর জগলুল পাশা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য ওয়াফদ্ দল গঠন করিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জগলুল প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মিশরের প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী জানাইলেন। জগলুল এক প্রতিনিধিদলসহ প্যারিস রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে ব্রিটিশ সরকার তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া মাল্টা'য় নির্বাসিত করিলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে মিশরে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নির্মমভাবে এই আন্দোলন দমন করেন (১৯২১)। ১৯২১ খৃঃ ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড মিলনার এবং সুলতান ফুয়াদের মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার মিশরকে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা প্রদান করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদীগণ এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করিল। জগলুলকে পুনরায় নির্বাসিত করা হইল। কিন্তু নূতন সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্টের নির্বাচনে ওয়াফদ দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। জগলুল প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ১৯২৪ খৃঃ সুদানের ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল স্যার লী ষ্ট্যাক কায়রোয় নিহত হইলে ইংলণ্ড মিশরের নিকট বিভিন্ন সর্ত সমন্বিত এক চরম পত্র প্রেরণ করিল। জগলুল হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯২৭ খৃঃ জগলুল মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাহাসপাশা ওয়াফদ দলের নূতন নেতা নির্বাচিত হন। জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সিদ্‌কীপাশা পিপলস্ পার্টি বা সাব দল গঠন করেন। তিনি জাতীয়বাদীদের দমন করিবার

মিশর

জগলুলপাশা

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। সিদ্‌কীপাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতার ফলে ১৯৩৩ খৃঃ তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯৩৬ খৃঃ নির্বাচনে ওয়াফদ দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং নাহাশ পাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিশর চুক্তির দ্বারা ইংলণ্ড মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়; মিশর হইতে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারে এবং দূত বিনিময়ে সম্মত হয়। কিন্তু সুয়েজখাল অঞ্চলে একদল ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল। রাজা ফারুকের সঙ্গে নাহাস-মন্ত্রিসভার বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৯৩৭ খৃঃ ফারুক নাহাস মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন।

ইঙ্গ-মিশর চুক্তি

আরব, ইরাক, সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন হইল আরবদের বাসভূমি। এই অঞ্চল ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আরবগণ কখনই তুর্কী শাসনকে সুনজরে দেখে নাই। বরং তাহারা তুর্কীদের ঘৃণা করিত। আরবগণ মনে করিত তুরস্কের সুলতানের খলিফা হইবার কোন অধিকারই নাই। মক্কার গ্রাণ্ড শরীফ হুসেনকেই তাহারা খলিফা পদের যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ইংরেজ সেনাপতি লরেন্স (Lawrence of Arabia) আরবদের তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য উৎসাহিত করেন। ইহাতেত আরবজাতীয়তাবাদ অদ্ভুত প্রেরণা লাভ করে, হুসেন এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভূমধ্যসাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক বিরাট আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিলেন। হুসেনের পুত্র ফৈসালের সহিত লরেন্সের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং আধিপত্য বিস্তার করা। বেদুইন শেখরা হুসেনের পতকাতলে সমবেত হইল। লরেন্স এবং অন্যান্য ইংরেজ অফিসারগণ আরবদের সমর বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। ১৯১৬ খৃঃ হুসেন হেজ্জাজে তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ সেনাপতি এলেনবী জেরুজালেম অধিকার করিবার অল্পকাল পরেই ফৈসাল ও লরেন্স সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস অধিকার করিলেন (১৯১৮)।

আরব জতীয়তাবাদ

হুসেনের নেতৃত্ব

কিন্তু ১৯১৯-২০ খৃঃ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে আরব জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হইল না। সিরিয়ায় ফরাসী এবং প্যালেষ্টাইন ও মেসোপ-

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ

টেমিয়ায় (ইরাক) ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসন প্রবর্তিত হইল। একমাত্র হুসেনকে হেজ্জাজের স্বাধীন আরব নৃপতি বলিয়া স্বীকার করা হইল। ফরাসীগণ সিরিয়া হইতে ফৈসালকে বহিস্কৃত করিল তাহার শাসনব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিল। অবশ্য ১৯২১ খৃঃ ইংলণ্ড ফৈসালকে ইরাকের রাজা করিল। হুসেনের আর এক পুত্র আবতুল্লাকে ট্রান্সজর্ডেনের রাজা করা হইল। ১৯৩২ খৃঃ এক

আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি

চুক্তিদ্বারা ইংলণ্ড ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল এবং পরিবর্তে ইরাকে অনেক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পাইল। ১৯৩৩ খৃঃ ফৈসালের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ঘাজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে ট্রান্সজর্ডনের রাজা আবদুল্লা শাসনকার্যে কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি ইংরেজদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া রহিলেন। ফৈসাল ও আবদুল্লার পিতা হুসেন হেজ্জাজের রাজা হইয়াছিলেন। আরব জগতে তিনি বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাহার বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে থাকে। ওয়াহাবীদের নেতা ইবনসউদ তাহাকে বিতাড়িত করিয়া হেজ্জাজ অধিকার করেন। হুসেন জেরুজালেমে পলায়ন করেন। ইবন সউদ হেজ্জাজের নাম রাখিলেন সউদি আরব। তাহার অধীনে সউদি আরবের উন্নতি হইতে থাকে। তিনি ইরাকের রাজা ফৈসাল এবং ট্রান্সজর্ডনের রাজা আবদুল্লার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন।

ইরাক, ট্রান্সজর্ডন, সউদি আরব

কিন্তু প্যালেষ্টাইনকে কেন্দ্র করিয়া মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিতে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হইল। প্যালেষ্টাইন বহুদিন যাবত আরব দেশে পরিণত হইলেও ইহা ছিল ইহুদীদের পবিত্র স্থান। প্যালেষ্টাইনে বহুসংখ্যক ইহুদী বসবাস করিত। সহস্র বৎসর যাবৎ ইহুদীরা ছিন্নমূল অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করিতেছিল। কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য তাহারা অম্লান রাখিয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে জাতীয় বাসভূমি স্থাপনের জন্য উৎসাহী হয়। তাহারা দলবদ্ধভাবে প্যালেষ্টাইনে গিয়া বসবাস করিতে থাকে। ইহাই 'জিয়নিজম' বা জিয়নিষ্ট আন্দোলন নামে খ্যাত। ১৯১৭ খৃঃ ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যালফুর ইহুদীদের চাপে পড়িয়া ঘোষণা করিলেন যে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমি স্থাপন করা হইবে, তবে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং অন্যান্য অধিকার বজায় থাকিবে। এই ঘোষণার ফলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের আগমন বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু আরবরা নীরবে এই ঘোষণা মানিয়া লইতে রাজী হইল না।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

আরম্ভ হইল জিওনিজম বিরোধী আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ১৯২৯ খৃঃ এবং ১৯৩৩ খৃঃ প্যালেষ্টাইনে ইহুদী বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ১৯৩৭ খৃঃ ব্রিটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু প্যালেষ্টাইন সমস্যা মিটিল না। ব্রিটিশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যে তাহার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ মধ্যপ্রাচ্য হইতে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৮৮২ অস্ট্রিয়া, ইটালী ও জার্মানীর মধ্যে ত্রিশক্তি মৈত্রী।
১৮৯০ বিসমার্কের পতন।
১৮৯১ ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিশক্তি মৈত্রী।
১৯০২ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী।
১৯০৭ ইঙ্গ-রুশ-ফরাসী আঁতাত।
১৯১২-১৩ বলকান যুদ্ধ।
১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯১৭ রুশ বিপ্লব।
১৯১৮ বিশ্বযুদ্ধের অবসান।
১৯১৯ প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ; ভার্সাই সন্ধি।
১৯২০ সেভার্সের সন্ধি। মুস্তাফা কামালের অভ্যুদয়।
১৯২৩ লুসানের সন্ধি ; রাষ্ট্রপতি কামাল আতাতুর্ক।
১৯১৫-৩৭ আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি।

প্রশ্নাবলী

1. What were the causes of the First world war?
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি কি?
2. What was the condition of Europe just before the First world war?
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্বে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল?

3. Critically examine the provisions of the Treaty of Versailles. Do you think that the Treaty of Versailles held the germs of another war ?
ভার্সাই সন্ধির সর্তাবলী আলোচনা কর। তুমি কি মনে কর ভার্সাই সন্ধির মধ্যে আর একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল ?

4. Write what you know about Kemal Ataturk and his contribution to Turkey.
কামাল আতাতুর্ক এবং তুরস্কের প্রতি তাহার অবদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

5. Give a short account of the rise and development of Arab Nationalism.
আরব জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ও অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

6. Write notes on ; Hussain ; Treaty of Sevres ; 'Fourteen point's of Wilson.
টীকা লিখ :—হুসেন ; সেভার্সের সন্ধি ; উইলসনের চৌদ্দদফা পরিকল্পনা।

নবম অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

জার শাসিত রাশিয়ার অবস্থা ঃ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী পুরুষ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ছিল ইউরোপের একটি অনগ্রসর দেশ। সমাজ ও রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়, মহামতি পিটার এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়াকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সফল হয় নাই। দেশের জনসাধারণ সার্ফ এবং অভিজাত শ্রেণী এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যাজক শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবিরা সংখ্যায় ছিল খুব অল্প। সার্ফ বা ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাহারা ভূস্বামী বা মালিকের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিল। ভূস্বামীরা তাহাদের নির্যাতন করিতে এবং বিক্রয় করিতে পারিত। এমনকি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করিতে এবং হত্যা করিতেও পারিত। ইহার জন্য মালিকদের কোন শাস্তি হইত না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন সার্ফদের অবস্থা পশুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল। জার ছিলেন রাশিয়ার স্বৈরশাসক; মন্ত্রিদের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বিচারকের স্বাধীনতা ছিল না। কোন পার্লামেণ্ট বা আইনসভাও ছিল না।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮০১-২৫) ঃ জার আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হইল ইউরোপের শক্তিবর্গের সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ। জার ছিলেন উদার মতাবলম্বী, আদর্শবাদী, কল্পনাপ্রবণ এবং স্বপ্ন-বিলাসী। তিনি ছিলেন 'পবিত্র মৈত্রী'র প্রতিষ্ঠাতা। ভিয়েনা কংগ্রেসে তাহার উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মেটারনিখের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির অনুগামী হইয়া পড়েন। ইউরোপের

বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব দমন করিবার জন্য মেটারনিখের নীতি সমর্থন করেন। ১৮২৫ খৃঃ তাহার মৃত্যু হয়।

প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-৫৫)ঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় সাময়িক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনস্ট্যানটাইনের স্থলে নিকোলাস সিংহাসনে আরোহণ করায় সৈন্য বিভাগে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় এবং বহু গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। তাহাদের ধ্বনি ছিল "কনস্ট্যানটাইন ও সংবিধান" (Constantine and the Constitution)। রাশিয়া কত অনগ্রসর এবং অশিক্ষিত দেশ ছিল তাহা একটি দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে। বিদ্রোহী সৈন্যদের অনেকে মনে করিত সংবিধান হইল কনস্ট্যানটাইনের স্ত্রী ("Constitution was Constantine's wife")।

নিকোলাস ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক; পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিরোধী। তিনি সংবাদপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করেন; রাশিয়ানদের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেন। ১৮৩০ খৃঃ পোলদের বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করেন এবং পোল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তুরস্ক সম্পর্কে তিনি সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। তিনি তুরস্ককে আড্রিয়ানোপলের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন এবং আনকিয়ার স্কেলেসির সন্ধি দ্বারা কৃষ্ণ সাগরে রুশ আধিপত্য বিস্তার করেন। মিশরে মেহমেত আলির ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড, প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত যোগদান করেন। ১৮৪৯ খৃঃ হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে সাহায্য করেন। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে নিকোলাসের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ব্যর্থ হয়। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-১৮৮১)ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছিল এবং রাশিয়ায় স্বৈরশাসনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল। জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উদার শাসক ছিলেন না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে ধূমায়িত অসন্তোষ প্রশমিত

করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন; অনেক বন্দীদের মুক্তিদান করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন এবং বিদেশ ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। দেশে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য হইল ভূমিদাস বা সার্ফদের মুক্তিদান। ১৮৫৮ খৃঃ তিনি সর্বপ্রথম সরকারী জমিতে নিযুক্ত সার্ফদের মুক্তিদান করেন। ১৮৬১ খৃঃ সমগ্র রাশিয়ায় আইন দ্বারা সার্ফদের মুক্তিদান করা হয়। এই কার্যের ফলে তিনি 'মুক্তিদাতা জার' নামে অভিহিত হন।

মুক্তিদাতা জার

অতঃপর প্রতি জেলায় সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া 'কাউন্সিল' গঠিত হইল; ইহাদের কাজ ছিল জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। আলেকজাণ্ডার বিচার বিভাগেরও আমূল সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু ১৮৬৩ খৃঃ পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের ফলে আলেকজাণ্ডার উদার নীতি পরিত্যাগ করিলেন। পোল বিদ্রোহ নির্মম ভাবে দমন করা হয়। রাশিয়ার অভ্যন্তরে পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭০ খৃঃ আলেকজাণ্ডার প্যারিসের সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণসাগরে রুশ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সানষ্টিফানোর সন্ধি দ্বারা অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করেন। বার্লিনের সন্ধির (১৮৭৮) ফলে তাহাকে অনেক সুযোগ সুবিধা পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য আফগানিস্থান ও পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে ব্লাডিভষ্টক পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। এদিকে জার শাসনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। নিহিলিস্ট নামে শিক্ষিত তরুণদের লইয়া গঠিত এক গুপ্তসমিতি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হইল। ১৮৮১ খৃঃ নিহিলিস্টদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে জার নিহত হন।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৮১-১৮৯৪): দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শোচনীয় মৃত্যুর পর তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসক। পিতার হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অনেককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন। জেলা কাউন্সিলগুলির ক্ষমতা খর্ব করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগুলিকে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধর্মে, আচার ব্যবহারে রুশ করিবার নীতি অনুসরণ করা হয় (Policy of Russifica-tion)। ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালে রাশিয়ায় শিল্প বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ স্থাপিত হয়। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সের সহিত দ্বিশক্তি মৈত্রী (Dual Alliance) স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭): তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই রাশিয়ার শেষ জার। তাহার শাসন ছিল স্বৈরাচারী এবং নির্যাতনমূলক। নিকোলাস ছিলেন সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী। কিন্তু রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষ ধীরে ধীরে জারের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল। ১৯০৪-৫ খৃঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে সমগ্র দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। জন-সাধারণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ দেশব্যাপী বিক্ষোভের আকারে ফাটিয়া পড়িল। রাশিয়ার পরাজয়ে জার শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল। জেলা কাউন্সিল (Zemstvos) গুলি সমবেতভাবে সংস্কার প্রবর্তনের দাবী করিল। মস্কো এবং অন্যান্য শিল্প প্রধান অঞ্চলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করিল। ১৯০৫ খৃঃ ফাদার গ্যাপন নামে একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে ধর্মঘটী শ্রমিকগণ জারের নিকট বিভিন্ন দাবী পেশ করিবার জন্য শোভাযাত্রা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তখন সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণে শত শত লোক নিহত হইল। সেদিন ছিল রবিবার। রাশিয়ার ইতিহাসে শত শহীদের রক্তরাঙ্গা ঐদিন "রক্তাক্ত রবিবার" নামে স্মরণীয়

দেশব্যাপী আন্দোলন

রক্তাক্ত রবিবার

হইয়া রহিল। কৃষকগণ বিদ্রোহী হইয়া জমিদারদের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করিল, পুলিশদের হত্যা করিতে লাগিল ; নৌবাহিনী এবং সৈন্যবাহিনীর একাংশে বিদ্রোহ দেখা দিল। জারের শাসন টলমল করিতে লাগিল।

দেশব্যাপী আন্দোলনে ভীত জার ডুমা বা জাতীয় সভা আহ্বান করিলেন, প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিদের পদচ্যুত করিলেন এবং বিখ্যাত 'অক্টোবর ম্যানিফেষ্টো" (১৯০৫) প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সভা সমিতি গঠনের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। ১৯০৬ খৃঃ ডুমা'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। প্রতিনিধিদের মধ্যে দলাদলির ফলে জারের সুবিধা হইল। জার সকল ক্ষমতার অধিকারী হইলেন, ডুমার কোন ক্ষমতা রহিল না। কারণ ভেটো প্রয়োগ করিয়া জার ডুমা'র যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার অধিকারী হইলেন। নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিগণ ভিবর্গে সমবেত হইল। তাহারা রাশিয়ার জনসাধারণকে কর প্রদান না করিতে এবং সৈন্যবিভাগে যোগদান না করিতে আহ্বান জানাইল। কিন্তু এই আবেদন সফল হইল না। ১৯০৭ খৃঃ দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল কিন্তু এই ডুমাও ব্যর্থ হইল। ঐ বৎসরই তৃতীয় ডুমা আহ্বান করা হইল। ভোটাধিকার সংকুচিত করিবার ফলে এই ডুমায় সরকারের সমর্থনকারীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। ফলে ডুমা জারের তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

ডুমার অধিবেশন আহ্বান

১৯০৬ খৃঃ ষ্টলিপিন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি কৃষকদের জমির উপর অধিকার স্বীকার করিয়া লন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন বৈধ করেন এবং কর্মচারীদের বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কিন্তু স্টলিপিন জারের স্বৈরশাসনের সমর্থক ছিলেন। ১৯১১ খৃঃ আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন।

কার্ল মার্কসঃ আধুনিক সমাজতন্ত্রের পথপ্রদর্শক হইতেছেন কার্ল মার্কস। অবশ্য মার্কসের পূর্বে সমাজতন্ত্র জন্মলাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে রবার্ট ওয়েন, সেণ্ট সাইমন এবং ফুরিয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র

গঠনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। ইহাদের পরবর্তীকালে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী নেতা লুই ব্ল্যাংক লুই ফিলিপির শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিতে না পারিলে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইবে না। কিন্তু ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রী সরকার গঠনে তাহার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। এই সকল ব্যর্থতা সত্বেও সমাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল।

কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের চিন্তা ও আদর্শের নূতন ব্যখ্যা করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ জার্মানীর অন্তর্গত রাইন নদীর তীরে এক ইহুদী পরিবারে কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, ইতিহাস এবং অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত, সাংবাদিক কার্ল মার্কস্ স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া প্যারিসে আসিলেন। এখানে বিখ্যাত মনীষী ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স এর সহিত তাহার পরিচয় হইল। এই পরিচয় আমরণ, অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে পরিণত হইল। প্যারিসে দীর্ঘদিন মার্কসের স্থান হইল না। তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। মার্কস্ পূর্বেকার সমাজতন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য নূতন পথ নির্দেশ করিলেন।

কার্ল মার্কস

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো

১৮৪৮ খৃঃ তিনি সুবিখ্যাত 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো (Communist Manifesto) প্রকাশ করিলেন। এই প্রচার পত্রে তিনি দেখাইলেন ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হইতেছে তাহার ফলে বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ১৮৬৭ খৃঃ তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস ক্যাপিটাল'এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ তাহার মৃত্যুর পর ইহার আরও দুইখণ্ড প্রকাশিত

ডাস ক্যাপিটাল

হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার ফলে মানুষের চিন্তাজগতে বিপ্লব সাধিত হইল। মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন ইতিহাস হইল শ্রেণী সংগ্রামের বিবরণ। ধনিকের সহিত শ্রমিকের, জমিদারের সহিত সার্ফ এবং চাষীদের, প্রভুর সহিত ক্রীতদাসের সংগ্রাম লাগিয়াই আছে। এই সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিপ্লবের দ্বারা সাফল্য অর্জন করিবে এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবেই। মার্কস কঠোর ভাষায় ধনিক শ্রেণীর নিন্দা করিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রী আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ লণ্ডনে মার্কসের দর্শনের অনুগামীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন (First International) অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম সম্মেলন ব্যর্থ হয়। ১৮৮৯ খৃঃ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (Second International) এবং ১৯১৯ খৃঃ রাশিয়ায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন (Third International) অনুষ্ঠিত হয়। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটিল এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইল।

মার্কসীয় দর্শন

রুশ বিপ্লবের পটভূমি ঃ রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দেশব্যাপী ক্রম-বর্ধমান অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া জার দ্বিতীয় নিকোলাস কিছু সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না। সুতরাং তাহাকে শীঘ্রই এমন এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইল যাহা শুধু জারতন্ত্রকেই সমূলে উচ্ছেদ করিল না, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিল।

রুশ বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে একাধিক কারণে এই এই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে জার শাসনের অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল। জারের মর্যাদা এবং সামরিক ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি রাশিয়ার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়ার সামাজিক ও

অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। অভিজাত শ্রেণী এবং সার্ফদের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। এমন কি যখন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সার্ফদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন তখনও সার্ফদের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। রাশিয়ার জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল সার্ফ। ইহাদের অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে পরিণত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ জারশাসনে রাশিয়ার জনসাধারণকে পাশ্চাত্য ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বিভিন্নভাবে রাশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে জনসাধারণ জারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। চতুর্থতঃ ফ্রান্সের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ রুশ সাহিত্যিকগণের রচনা রাশিয়ার তরুণ সমাজকে জার শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। টলষ্টয়, টুর্গেনিভ এবং ডষ্টয়ভস্কির রচনা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মার্কস ও বাকুনিনের আদর্শে বুদ্ধিজীবি শ্রেণী রাজনৈতিক সংস্কার দাবী করিল। জার নিহিলিষ্টদের শক্তিহীন করিলেন কিন্তু সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

বিপ্লবের কারণ

শিল্পোন্নয়নের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় অজস্র কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং বহু সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। দরিদ্র সার্ফগণ কলকারখানায় চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রমিকদের অসন্তোষ এবং আন্দোলনের ফলে সমাজতন্ত্রের দ্রুত প্রসার হইতেছিল। এই সময় রাশিয়ায় মহাবিপ্লবী লেনিনের আবির্ভাব হইল (অন্য নাম ভ্লাডিমির উলিয়ানভ)। তিনি শ্রমিক ও সার্ফদের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভকে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দান করিলেন। ১৮৯৫ খৃঃ সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী শ্রমিকদের ওয়ার্কমেনস্ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠিত হইল। ১৯০১ খৃঃ মধ্যবিত্তদের

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল

লেনিন

নেতৃত্বে কৃষকদের সোস্থাল রিভলিউসানারী পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু সোস্থাল ডেমোক্রাটিকদল ক্রমে শক্তিশালী হইয়া পড়ে। ১৯০৩ খৃঃ এই দলে ভাঙ্গন হয়। লেনিনের নেতৃত্বে চরমপন্থীগণ বলশেভিক নামে পরিচিত হইল এবং নরমপন্থীগণ মেনশেভিক নামে পরিচিত হইল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস বুদ্ধিজীবি ও শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বরং পূর্বের ন্যায় দমন নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

বিপ্লব : রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় তখন ১৯১৪ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যোগদান করিল কিন্তু ১৯১৫ খৃঃ জার্মানীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। জার শাসনের দুর্বলতা এবং অকর্মন্যতা প্রকট হইয়া পড়িল। জনসাধারণ জার শাসনের অবসান দাবী করিল। গুজব রটিয়া গেল জার জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। জারিনা এবং রাসপুটিনের নেতৃত্বে জারের সমর্থক একটি দল শান্তি চাহিতেছিল। কারণ যুদ্ধ চলিলে জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইবে এবং জারের পতন হইবে। এই সংবাদে জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইল। ডুমার সদস্যগণ এবং সেনাধ্যক্ষগণ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় বাধা সৃষ্টির অভিযোগ আনিলেন। ক্ষুব্ধ জনতার হস্তে রাসপুটিন নিহত হইলেন। দেশব্যাপী দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং ধর্মঘট আরম্ভ হইল। সৈন্যগণ সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করিতে লাগিল। রুটির অভাব দেখা দিল। জনসাধারণের দুর্দশার সীমা রহিল না। ১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাফে রুটির জন্য হাঙ্গামা সুরু হইল। কলকারখানায় শ্রমিকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করিল। সৈন্য এবং ধর্মঘটীদের লইয়া একটি সোভিয়েত বা কাউন্সিল গঠিত হইল। ডুমা জারকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল এবং একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিল। বিপ্লব সংঘটিত হইল।

বিপ্লব ; জার শাসনের অবসান

কিন্তু অস্থায়ী সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ইহারা কতকগুলি বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু জনসাধারণ চাহিতেছিল

রুটি, জমি এবং শান্তি। অস্থায়ী সরকার দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। আলেকজাণ্ডার কেরেনেস্কীর নেতৃত্বে মেনশেভিক বা নরমপন্থী সমাজতন্ত্রীগণ ক্ষমতা দখল করিলেন। কিন্তু লেনিন এবং ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিকগণ কেরেনেস্কীর কর্মসূচী সমর্থন করিলেন না। লেনিন ও ট্রটস্কি বলশেভিকদের সুগঠিত এবং শক্তিশালী করিয়া মেনশেভিকদের বিতাড়িত করিয়া ক্ষমতা দখল করিলেন। কেরেনেস্কী দেশত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

কেরেনেস্কীর পলায়ন

বলশেভিক সরকার ঃ ক্ষমতা লাভ করিবার পর লেনিন ও ট্রটস্কি রাশিয়াকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রেষ্ট—লিটোভস্কের সন্ধি দ্বারা জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করা হইল। অতঃপর চাষীদের মধ্যে জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। বিনা ক্ষতিপূরণে কল কারখানা জাতীয়করণ করা করা হইল। লেনিন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠনে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইল। কিন্তু ইহার ফলে গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। সহর অঞ্চলের শ্রমিকগণ এবং গ্রামাঞ্চলের চাষীগণ বলশেভিকদের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু অভিজাতশ্রেণী, ব্যবসায়ী এবং ধর্মযাজকগণ বলশেভিকদের বিরোধিতা করিল। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব তাহারা বরদাস্ত করিতে পারে নাই। ফলে আরম্ভ হইল উভয় দলের মধ্যে সংঘাত। কিন্তু 'চেকা' নামে এক ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া বলশেভিক সরকার সহস্র সহস্র মানুষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল। ১৯১৮ খৃঃ জুলাই মাসে জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল।

বলশেভিকদের ক্ষমতালাভ

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনে এবং বলশেভিকদের বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের প্রচারে পশ্চিমী শক্তিগুলি আতংকিত হইয়া পড়িল। লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত বলশেভিক সরকারকে অংকুরেই বিনাশ করিবার জন্য তাহারা বলশেভিক সরকারকে স্বীকার করিল না। ১৯১৮ খৃঃ হইতে ১৯২২ খৃঃ পর্যন্ত

মিত্র পক্ষ রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া বলশেভিক সরকারকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিল। উত্তর রাশিয়ায় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইল। জাপানী সৈন্যগণ ব্লাডিভষ্টক দখল করিল। ককেসাসে ইংরেজ সৈন্যদল এবং দক্ষিণ রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ফরাসী সৈন্যদল ঘাঁটি স্থাপন করিল। কোজাক বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিল; সাইবেরিয়াতেও বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সকল শক্তি সমবেত হইল। পোল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু বলশেভিকদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হইল না। প্রথমতঃ বিদ্রোহীদের কোন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ কৃষক এবং শ্রমিকগণ দৃঢ়ভাবে বলশেভিকদের সমর্থন করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ বৈদেশিক শক্তিগুলিও পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে নাই। রাশিয়ার ন্যায় বিরাট দেশে সাফল্য লাভ করা সহজ ছিল না। ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিক সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের নির্মূল করিল। ১৯১৯ খৃঃ বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী রাশিয়া পরিত্যাগ করিল।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র ঃ রাশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইল। প্রতি শহর এবং জেলায় সোভিয়েত বা কাউন্সিল গঠিত হইল। শহর এবং জেলা সোভিয়েতের প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক সোভিয়েত গঠিত হয়। এই প্রাদেশিক সোভিয়েতের প্রতিনিধি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত গঠিত হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে। এই কেন্দ্রীয় কমিটি মন্ত্রিসভার সদস্য মনোনীত করে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে আঠারো বৎসরের উর্দ্ধ সকল নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা হইল। কিন্তু ধর্মযাজক এবং অভিজাতদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নাম হইল "Union of the Soviet Socialist Republics" (U. S. S. R)। মুখ্যতঃ শ্রমিক ও কৃষকদের লইয়া গঠিত বলশেভিক দল শাসন ক্ষমতা অর্জন করিল। সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। রাশিয়ায় একটিমাত্র দল থাকিবে, তাহা হইল কমিউনিষ্ট পার্টি। মার্কসের সমাজতন্ত্রের আদর্শ সফল হইল।

রাশিয়ার পুনর্গঠন : লেনিন ; ষ্ট্যালিন : বলশেভিকগণ ক্ষমতা অর্জনের পর ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করে। ইহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। অভিজাতদের জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া চাষীদের জমি দেওয়া হইলেও অতিরিক্ত শস্য সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে হইত। ইহাতে কৃষকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা কম উৎপাদন করিবার সিদ্ধান্ত করে। ১৯২১ খৃঃ রাশিয়ায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। কল কারখানা রাষ্ট্রায়াত্ত করিয়া শ্রমিকদের হস্তে পরিচালনার ভার অর্পণ করা

সোভিয়েত রাশিয়া

হইয়াছিল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী কলকারখানা পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ছিল। ফলে কল কারখানায় উৎপাদন কমিয়া গেল, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাইল। লেনিন নীতি পরিবর্তন করিলেন। কৃষকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইল। ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্ষুদ্র শিল্প গঠনের অধিকার প্রদান করা হইল। তবে ভারী শিল্প রাষ্ট্রের হাতে রহিল। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে লেনিনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১৯২৪ খৃঃ এই মহাবিপ্লবীর জীবনের অবসান হয়।

লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে ক্ষমতা লইয়া তীব্র বিরোধ দেখা দিল। রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে লেনিনের পরই হইলেন ট্রটস্কি; লেনিনের দক্ষিণ হস্ত, লাল ফৌজের সংগঠনকারী। ট্রটস্কি বিশ্ব বিপ্লবের ধ্বনি তুলিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন চাহিলেন প্রথমে রাশিয়াকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিল। শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিনের জয় হইল। ট্রটস্কি কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বহিস্কৃত হইলেন এবং ১৯২৯ খৃঃ দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। নির্বাসিত অবস্থায় আততায়ীর হস্তে ট্রটস্কি নিহত হন।

ট্রটস্কি

ট্রটস্কিকে সরাইবার পর ষ্ট্যালিন রাশিয়ার অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৯২৮ খৃঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। কয়লা, লৌহ এবং পেট্রোলের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানায় দেশ ছাইয়া গেল। কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি হইল। যৌথ খামার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করা হইল। ১৯৩২ খৃঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ষ্ট্যালিন শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন। ১৯২৪ খৃঃ ইংলণ্ড ও ইটালী রাশিয়ার নূতন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য রাষ্ট্রও রাশিয়ার নূতন সরকারকে স্বীকৃতি দান করিল। রাশিয়ার সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হইল।

ষ্ট্যালিন

রুশ বিপ্লবের ফলে বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের আন্দোলন নূতন প্রেরণা লাভ করিল। শোষিত ও পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে আশার সঞ্চার হইল। সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৮০১ জার আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
১৮২৫ জার প্রথম নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণ।
১৮৪৮ কার্ল মার্কসের 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'।
১৮৫৫ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
১৮৫৪-৫৬ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।
১৮৮১ জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
১৮৯৪ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণ।
১৯০৫-১৬ লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলন।
১৯১৭ রুশ বিপ্লব।
১৯১৮-২২ রাশিয়ায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপ।
১৯১৮ সোভিয়েত সংবিধান।
১৯২৪ লেনিনের মৃত্যু।
১৯২৮ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।
১৯২৯ ট্রটস্কির নির্বাসন।

প্রশ্নাবলী

1. Write what you know about Russia under the Czars.
জার শাসিত রাশিয়া সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
2. Who was Karl Marx? Write what you know about his philosophy.
কার্ল মার্কস কে ছিলেন? তাহার দর্শন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
3. Describe the causes of the Russian Revolution.
রুশ বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর।
4. Write how Lenin reconstructed Russia after the Revolution.
বিপ্লবের পর লেনিন কিভাবে রাশিয়াকে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন তাহা লিখ।

দশম অধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল
(১৯১৯-৩৯)

লীগ অব নেশনস্ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর রাষ্ট্রনায়কগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইড্রো উইলসন তাহার পরিকল্পিত 'চৌদ্দ দফা' পরিকল্পনা পেশ করেন। ইহার মধ্যে একটিতে একটি বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ গঠনের প্রস্তাব ছিল। রাষ্ট্রপতি উইলসনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অন্যান্য প্রতিনিধিগণও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইহারাই ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল 'লীগ অব নেশনস্' বা রাষ্ট্রসংঘ। ইহার উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে লীগের কার্যালয় স্থাপিত হইল। লীগের কার্য পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারী-জেনারেল নিযুক্ত করা হইল। একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি কাউন্সিল গঠন করা হইল। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন লীগের অধীনে গঠন করা হইল।

প্রথম হইতে লীগের ভিত্তি ছিল দুর্বল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই রাষ্ট্রসংঘে কোনদিনই যোগদান করে নাই। জার্মানী এবং রাশিয়াকে দীর্ঘদিন সংঘে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯২৬ খৃঃ জার্মানীকে এবং ১৯৩৪ খৃঃ রাশিয়াকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় লীগ সাফল্য অর্জন করে। জার্মানী-পোল্যাণ্ড বিরোধ; যুগোশ্লাভিয়া-আলবেনিয়া বিরোধ; গ্রীস-বুলগেরিয়া বিরোধ, লীগের মধ্যস্থতার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে মীমংসা হয়। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বিরোধ মিটাইতে এবং সাম্রাজ্যলিপ্সা দমন করিতে লীগ সম্পূর্ণভাবে

সাফল্য

ব্যর্থ হইল। ১৯৩১ খৃঃ জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল, তখন চীন রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করিল। কিন্তু লীগ জাপানকে নিরস্ত করিতে পারিল না। লীগ জাপানের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে জাপান লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিল (১৯৩৩)। ১৯৩৫ খৃঃ ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে লীগ কিছুই করিতে পারিল না। ইটালী রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ করিল। জার্মানীও ১৯৩৩ খৃঃ লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল। ১৯৩৯ খৃঃ বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সই লীগের সদস্য ছিল। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তি রক্ষায় লীগ সফল হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া পঙ্গু রাষ্ট্র-সংঘকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

ব্যর্থতা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ১৯১৯-৩৯ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সামান্য আলোচনা পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায় করা হইয়াছে। বিশ্ব-যুদ্ধের পর ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্র নিদারুন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। ১৯২৯ খৃঃ হইতে ১৯৩১ খৃঃ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়াছিল। ইউরোপের জনসাধারণ আন্তরিকভাবে শান্তি চাহিয়াছিল। প্রতিটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল। ১৯১৭ খৃঃ রুশ বিপ্লব এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস আমরা আলোচনা করিয়াছি। ১৯২৪ খৃঃ লেনিনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়াকে একাধিক শক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ এবং একাধিক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে লেনিন পৃথিবীর প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়াকে বিপদমুক্ত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চীনের মুক্তি সংগ্রামে লেনিন সান-ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লেনিনের পর ষ্ট্যালিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাশিয়া দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা (১৯২৮-৩২ ; ১৯৩৩-৩৮) ষ্ট্যালিন রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থা এবং শিল্প বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃঃ রাশিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। ষ্ট্যালিন

সোভিয়েত রাশিয়া

শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের উন্নতি করেন। রাশিয়ায় সাফল্যের ফলে কম্যুনিজম, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী ইটালী ও চীনে ছড়াইয়া পড়ে। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ১৯৩৯ খৃঃ রাশিয়া হিটলারের নাৎসী জার্মানীর সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করে, এবং পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাজ্যগুলি গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

রণক্লান্ত ইটালী অবর্ণনীয় আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। দেশের মধ্যে অরাজকতা এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রমিক সমস্যা এবং বেকার সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। কম্যুনিষ্টদের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি হইতেছিল। এই সময় ইটালীর প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সরকার সমস্যা সমাধানে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। এই সময় ইটালীর রাজনৈতিক জগতে আবির্ভূত হইলেন বেনিতো মুসোলিনী। ১৮৮৩ খৃঃ এক কর্মকারের গৃহে মুসোলিনীর জন্ম হয়। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত, বেকার সৈনিক এবং তরুণদের লইয়া মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট দল গঠন করেন। প্রথম জীবনে মুসোলিনী ছিলেন সমাজতন্ত্রী দলের সভ্য। মুসোলিনীর অনুগামী ফ্যাসিষ্টগণ কালো সার্ট পরিধান করিত। মুসোলিনীর নেতৃত্বে দ্রুত ফ্যাসিষ্ট দলের শক্তি বৃদ্ধি হইল। সমাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে দেশব্যাপী সংঘর্ষ হইতে লাগিল। ফ্যাসিষ্টগণ সমাজতন্ত্রীদের নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহাদের সভা সমিতি ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল এবং সমাজতন্ত্রীদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। ১৯২২ খৃঃ মুসোলিনী বলপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিলেন। ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর মুসোলিনী সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া ১৯৩৫ খৃঃ আবিসিনিয়া অধিকার করিলেন। তিনি জার্মানীর সহিত একযোগে স্পেনে ফ্রাংকোর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিলেন। ১৯৩৯ খৃঃ মুসোলিনী আলবেনিয়া অধিকার করিলেন। জাপান ও জার্মানীর সহিত তিনি মৈত্রী স্থাপন করিলেন।

ইটালী; ফ্যাসিবাদ; মুসোলনীর আবির্ভাব

১৯১৯ খৃঃ ভার্সাই সন্ধি দ্বারা বিজয়ী মিত্রপক্ষ জার্মানীর উপর চরম অবিচার ও প্রতিশোধমূলক আচরণ করিয়াছিল। জার্মানীর উপর পর্বত প্রমান ক্ষতিপূরণের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিমের সমৃদ্ধ অঞ্চল জার্মানী হইতে বিছিন্ন করা হইয়াছিল। সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জার্মানীকে পদানত এবং শৃংখলিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ জার্মানী প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। যুদ্ধের পর জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২০ এবং ১৯২৩ খৃঃ প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে জার্মানী অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পররাষ্ট্রনীতি উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ভার্সাই সন্ধির অপমান জার্মান জাতি বিস্মৃত হয় নাই। এই পটভূমিতে হিটলারের অভ্যুদয় হইল। তিনি জার্মানীর দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। হিটলার ন্যাশনাল সোসালিষ্ট বা নাৎসী দল গঠন করিলেন। বিক্ষুব্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদীগণ তাহার পতাকাতলে সমবেত হইল। হিটলারের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইল যে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবার্গ তাহাকে চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে হিটলার সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করিয়া জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন। অতঃপর হিটলার ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইলেন এবং কম্যুনিষ্টদের শক্তি চূর্ণ করিলেন। সমগ্র জার্মানীকে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনাধীন করা হইল। ১৯৩৪ খৃঃ হিটলার জার্মানীর রাষ্ট্রপতি ও ডিক্টেটর হইলেন—জার্মান জাতির ফুরার। জার্মানীর শিক্ষা, অর্থনীতি সবকিছুই সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে আনা হইল। ব্যক্তি স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। অতঃপর হিটলার জার্মানীর পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য উগ্র পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাংকোকে ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিলেন। ১৯৩৬ খৃঃ হিটলার জাপান ও ইটালীর সহিত মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের

জার্মানী

নাৎসী দল, হিটলার

বিরুদ্ধে কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি করিলেন। জাপান-জার্মানী-ইটালী মৈত্রী স্থাপিত হইল। ১৯৩৮ খৃঃ হিটলার অষ্ট্রিয়া দখল করিলেন। অতঃপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিতে উদ্যত হইলেন। ১৯৩৮ খৃঃ মিউনিক চুক্তির দ্বারা হিটলারকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনল্যাণ্ড অর্পণ করা হইল। ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালী চেকোশ্লোভাকিয়ার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। কিন্তু হিটলার মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ছয় মাসের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করিলেন। হিটলারের নাৎসীবাদ বিশ্বকে আর একটি যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল।

হিটলারের আক্রমনাত্মক কার্যকলাপ

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৩৬ খৃঃ গণতান্ত্রিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে স্পেনের নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সরকার গঠন করে। কিন্তু সরকারের নীতি কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন এবং রাশিয়া ঘেঁষা এই অভিযোগে জেনারেল ফ্রাংকো বিদ্রোহ করিলেন। ফলে আরম্ভ হইল গৃহযুদ্ধ বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী এবং কম্যুনিষ্টরা প্রজাতন্ত্রীদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিল। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর সাহায্যে ফ্রাংকো জয়লাভ করিলেন। স্পেনে ফ্রাংকোর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্পেনে ফ্রাংকোর একনায়কতন্ত্র

তুরস্কে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে যে জাতীয় অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কামালের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত নব্য তুরস্ক শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা মিশরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল। জগলুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ্ দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। জগলুলের মৃত্যুর পর নাহাশ পাশা ওয়াফদ দলের নেতা হন। মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তব্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি ব্যর্থ হয়। ১৯৩৬ খৃঃ ইঙ্গ-মিশর চুক্তির দ্বারা ইংলণ্ড মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। যুদ্ধের সময় পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৭ খৃঃ মিশর, লীগ অব নেশনস এর সদস্য হয়। কিন্তু সুয়েজ খাল অঞ্চলে ব্রিটিশ

তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য

প্রভুত্ব বজায় রহিল ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রহিল। ১৯১৯ খৃঃ হইতে ১৯৩৯ খৃঃ পর্যন্ত আরব জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরব দেশগুলিকে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ম্যাণ্ডেটারী শাসনে রাখা হয়। ১৯৩২ খৃঃ ইংলণ্ডের সহিত এক চুক্তির ফলে ইরাক স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ট্রান্সজর্ডনে ব্রিটিশ প্রভুত্ব রহিল। ১৯২৫ খৃঃ ইবন সৌদ সউদী আরবের সিংহাসন অধিকার করেন এবং আরব জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ পারস্য ছিল নামে মাত্র স্বাধীন দেশ। ১৯২৫ খৃঃ শাহকে পদচ্যুত করিয়া প্রধানমন্ত্রী রেজা শাহ পহ্লবী পারস্যের সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তৈল সম্পদের উপর বিদেশী প্রভাব বজায় রহিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ১৯১২ খৃঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী জাপানের একুশ দফা দাবী মানিয়া লইবার ফলে চীনে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ১৯২১ খৃঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হার্ডিং দূর প্রাচ্য সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে জাপান চীনের শান-টুং অঞ্চল প্রত্যর্পণ করে। নয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি দ্বারা চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইল। এদিকে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাহার বিশ্বস্ত অনুচর চিয়াং কাই শেকের উপর কুয়োমিণ্টাং দলের নেতৃত্বভার অর্পিত হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের সহিত চিয়াং এর বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ দমন করেন এবং রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু চিয়াং মাঞ্চুরিয়াসহ সমগ্র চীনের ঐক্য সাধন করেন এবং পিকিং হইতে রাজধানী নানকিংএ স্থানান্তরিত করেন। চিয়াং আভ্যন্তরীন উন্নতির জন্য একাধিক সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং চীনকে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের সহিত তাহাকে ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। মাও সে তুং, চু তে এবং চু এন লাই প্রভৃতি

চীন ; সান-ইয়াৎ-সেন

নেতার অধীনে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে। ১৯৩৭ খৃঃ জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন কুয়োমিণ্টাং ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কম্যুনিষ্টদের নিকট চিয়াং পরাজিত ও বিতাড়িত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দুর্বল চীনের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা ছিল সাম্রাজ্যবাদী জাপানের লক্ষ্য। জাপানের নৌ-শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জাপবাহিনী ১৯৩১ খৃঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। রাষ্ট্রসংঘ জাপানের কার্যের নিন্দা করায় জাপান রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ করিল। ১৯৩৭ খৃঃ জাপান সমগ্র উত্তর চীন গ্রাস করিবার জন্য সর্বাত্মক আক্রমণ আরম্ভ করিল। চীনের কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিণ্টাং দল এক হইয়া জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ইহার পূর্বে জাপান ১৯৩৬ খৃঃ জার্মানী ও ইটালীর সহিত আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব ইহাই ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদ

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৯২২ মুসোলিনীর ক্ষমতালাভ।
১৯৩১ জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল।
১৯৩৩ হিটলারের সর্বময় কর্তৃত্বলাভ।
১৯৩৫ মুসোলিনীর আবিসিনিয়া আক্রমণ।
১৯৩৮ হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল।
১৯৩৮ হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া দখল।
১৯৩৭ স্পেনে ফ্রাংকোর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৭ চীন-জাপান যুদ্ধ।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the activities of the League of Nations.
রাষ্ট্রসংঘের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

2. Write an essay on international relations between the two world wars.
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা কর।

3. Write what you know about the rise of Hitlar in Germany and Mussolini in Italy.
জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয় ও ইটালীতে মুসোলিনীর অভ্যুদয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

একাদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হিটলার এবং মুসোলিনীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর প্রতি চরম অন্যায়, অবিচার ও অপমান করা হইয়াছিল। জার্মানীকে পদানত ও শৃংখলিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ফলে জার্মান জাতির মধ্যে যে ক্ষোভ ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহাই হিটলারের নেতৃত্বে উগ্র জাতীয়তাবাদ বা নাৎসীবাদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। জার্মান জাতির মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া হিটলার ইউরোপে জার্মান প্রভুত্ব বিস্তারে অগ্রসর হইলেন। ১৯৩৬ খৃঃ হিটলার ইটালী ও জাপানের সহিত কম্যুনিষ্ট বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন (Anti-Comintern Pact)। হিটলারের সহিত মুসোলিনীর দৃঢ় মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মান জঙ্গীবাদ ইউরোপ তথা পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। ১৯৩৮ খৃঃ হিটলার অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলেন। অতঃপর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জার্মানী ও ইটালীর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯৩৮ খৃঃ মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বদেতানল্যাণ্ড জার্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং চতুঃশক্তি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনকে বোকা বানাইয়া হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিলেন। অতঃপর হিটলার লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল আত্মসাৎ করিলেন। ইউরোপের আকাশে আর একটি

ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানীর ক্ষোভ

জার্মান জঙ্গীবাদ

হিটলারের অস্ট্রিয়া অধিকার

চেকোশ্লোভাকিয়া ও মেমেল অধিকার

বিশ্বযুদ্ধের কৃষ্ণমেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড জার্মানীর প্রতি তোষণ নীতি পরিত্যাগ করিয়া কঠোর নীতি অবলম্বন করিল। কিন্তু হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি ডানজিগ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলেন এবং পোলিশ করিডর বা সড়ক জার্মানীকে অর্পণ করিবার দাবী করিলেন। চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে। অতঃপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং পোল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হইল। চেম্বারলেন রাশিয়ার সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মিউনিক চুক্তিতে রাশিয়াকে আহ্বান না করায় রাশিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। চেম্বারলেনের রাশিয়ার সহিত মৈত্রী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই সময় একটি সংবাদে ইউরোপ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল। ১৯৩৯ খৃঃ ২৩ শে আগষ্ট কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এবং নাৎসীবাদী জার্মানীর মধ্যে দশবৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। হিটলারের ধারণা ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই জার্মান সৈন্য-বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। ৩রা সেপ্টেম্বর ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রুশ-জার্মান মৈত্রী

হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সর্বাত্মক যুদ্ধ। জাতির সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি যুদ্ধে নিয়োগ করা হইয়াছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের প্রভাব হইতে কোন রাষ্ট্র নিস্তার পায় নাই। তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই যুদ্ধ বিদ্যুৎগতিতে পরিচালিত হইয়াছিল। হিটলার তিন মাসের মধ্যে ছয়টি জাতিকে পদানত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বেপরোয়াভাবে বোমারু বিমান ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা পৃথক ও অধিকতর ভয়াবহ। বোমা বর্ষণ এবং সাবমেরিনের দ্বারা হিটলার শত্রুপক্ষকে

নিশ্চিহ্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চতুর্থতঃ এই যুদ্ধ ছিল আদর্শের যুদ্ধ। জার্মানরা দাবী করিত তাহারা 'শ্রেষ্ঠ জাতি' (Master race) সুতরাং অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে। নাৎসীদের একনায়কত্বে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না। নাৎসীবাদ সমস্ত জাতির স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার এবং সভ্যতা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুতরাং জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতা, এবং সভ্যতা রক্ষার সংগ্রাম।

হিটলার

যুদ্ধের গতি ঃ ১৯৩৯ খৃঃ জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে পোল্যাণ্ডের পতন হইল। পূর্ব দিক হইতে রাশিয়াও অগ্রসর হইয়া পোল্যাণ্ডের একাংশ আত্মসাৎ করিল। অতঃপর হিটলার বিদ্যুৎগতিতে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স অধিকার করিলেন। জার্মান বাহিনী ১৯৪০ খৃঃ ৫ই জুন ফ্রান্সে প্রবেশ করিল। ফরাসী সেনাপতি মার্শাল পেতা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সময়ে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালী জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিল।

হিটলার কর্তৃক ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স অধিকার

হিটলার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ড আক্রমণ করিলে ইংলণ্ডের পতন হইত। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের মনোবল এবং শক্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সাবমেরিণের সাহায্যে বেপরোয়াভাবে ইংরেজ জাহাজ ডুবাইতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র বিমান হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় বোমাবর্ষণ করিয়া লণ্ডন সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডও হ্যারিকেন (Hurricans) এবং স্পিটফায়ারের

ইংলণ্ডের উপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ

(Spitfires) সাহায্যে জার্মান বিমান ধ্বংস করিতে লাগিল। হিটলার ইংরেজ জাতির মনোবল ধ্বংস করিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইল।

এদিকে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ড যখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন মুসোলিনী মিশর এবং সুয়েজখাল সহ উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি দখল করিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যের পর ইটালীয় বাহিনীর বিপর্যয় হইল। ইংরেজ সেনাপতি ওয়াভেল ইটালীয় বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ইটালীর উপনিবেশ এরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া ও সাইরেনাইকা অধিকার করিলেন। পরে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইল। ইটালীকে সাহায্য করিবার জন্য হিটলার রোমেলকে আফ্রিকায় প্রেরণ করিলেন। রোমেল ঝটিকা গতিতে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মিশরের দিকে অগ্রসর হইলেন। রোমল আলেকজান্দ্রিয়ার আশী মাইলের মধ্য উপনীত হইলেন এবং সুয়েজ খাল দখল করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল মণ্টোগোমারী এল আলামিনের যুদ্ধে রোমলের সৈন্যবাহিনী পরাজিত এবং বিতাড়িত করিলেন। আফ্রিকায় ব্যর্থতার ফলে মুসোলিনী সংকটের সম্মুখীন হইলেন।

আফ্রিকায় যুদ্ধ

এল আলামিনের যুদ্ধে রোমেলের পরাজয়

১৯৪১ খৃঃ হিটলার গ্রীস অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। ও জাপানও যুদ্ধে অবতরণ করিল। অকস্মাৎ জাপানী বিমানবহর পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া আমেরিকার নৌঘাঁটি ধ্বংস করিয়া দিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী এবং ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিল। ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া, জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইল।

হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ, জাপান ও আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিন জার্মানী, জাপান ও ইটালীকে ধ্বংস করিবার জন্য সমস্ত

শক্তি নিয়োজিত করিলেন। রাশিয়ার হাজার মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে জার্মানীর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। একটি জার্মানীর বাহিনী ইউক্রেনের মধ্য দিয়া ককেসাস পর্যন্ত অগ্রসর হইল। আর দুইটি বাহিনী মস্কো ও লেলিনগ্রাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশপ্রেমিক রুশ বাহিনী জার্মান সৈন্য-বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইল। রাশিয়ানরা 'পোড়ামাটি' নীতি অবলম্বন করিয়া পশ্চাদপসরন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া ষ্ট্যালিনগ্রাদে দণ্ডায়মান হইল। ছয় মাস ব্যাপী ষ্ট্যালিন-গ্রাদের রক্তাক্ত এবং ভয়াবহ ঐতিহাসিক সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনী পরাজিত হইল। জার্মানীর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট বারো হাজার সৈন্য রাশিয়ার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।
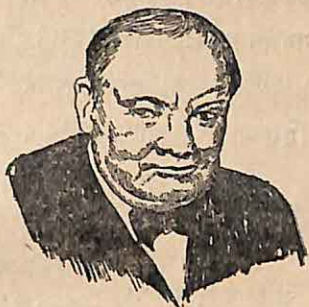
চার্চিল

ষ্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ; জার্মানীর পরাজয়

এদিকে পার্ল হারবার আক্রমণের তিন দিনের মধ্যে জাপান প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং রিপালস্ নামক দুইখানি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ডুবাইয়া দিল। জাপান বিদ্যুৎগতিতে হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর এবং ব্রহ্ম অধিকার করিয়া ভারত সীমান্তে উপনীত হইল।

জাপানের সাফল্য

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ভারত হইতে পলায়ন করিয়া জার্মানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। জার্মানীতে তিনি বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। ইহার পর সুভাষচন্দ্র জাপানে উপনীত হন। জাপানে ভারতের আর একজন বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া স্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ভারত স্বাধীন করা। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হস্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীর

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ

দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। সুভাষচন্দ্র নেতাজী নামে পরিচিত হইলেন। ভারতের পূর্ব সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল। কিন্তু জাপানের পরাজয়ের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

আফ্রিকায় আইসেনহাওয়ারের নিকট জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ

উত্তর আফ্রিকায় যখন মণ্টোগোমারী রোমেলের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন তখন আমেরিকান সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার নূতন সৈন্য বাহিনী লইয়া আফ্রিকায় উপনীত হইলেন। উভয় সৈন্য বাহিনী তিউনিসিয়ায় মিলিত হইল। ১৯৪৩ খৃঃ জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। ইহার পর সিসিলির পতন হইল। মিত্র পক্ষের সৈন্যবাহিনী ইটালীতে অবতরণ করিল এবং রোম অভিমুখে অগ্রসর হইল। ১৯৪৪ খৃঃ রোমের পতন হইল। ইটালী বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করিল। ইহার পূর্বে মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন। ফ্যাসী বিরোধীদের গুলিতে তিনি নিহত হন।

মুসোলিনী

ইটালীর আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষ জার্মানীকে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইল। প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করিয়া জার্মানীর শিল্পাঞ্চলগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। ১৯৪৪ খৃঃ ৬ই জুন জেনারেল আইসেনহাওয়ার বিরাট সৈন্য বাহিনী লইয়া নর্মাণ্ডীতে অবতরণ করিলেন। জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডকে মুক্ত করা হইল। জার্মানী বাহিনীকে জার্মানীর অভ্যন্তরে বিতাড়িত করিয়া মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী রাইন নদী অতিক্রম করিয়া বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হইল। এদিকে পূর্বদিক হইতে রুশ বাহিনী পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বার্লিনে প্রবেশ করিয়াছিল। পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া হিটলার আত্মহত্যা করিলেন। ১৯৪৫ খৃঃ ৭ই মে জার্মানী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিল।

জার্মানীর আত্মসমর্পণ

প্রাচ্যের রণাঙ্গনে জাপান পরাজিত হইয়া ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতেছিল। ব্রহ্ম, সিংঙ্গাপুর, মালয়, হংকং এবং ফিলিপাইন হইতে জাপানীগণ বিতাড়িত হইল। সর্বত্র জাপান পরাজিত হইতে লাগিল। মিত্রপক্ষ আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়া জাপানের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিল। কিন্তু জাপান এই চরমপত্র প্রত্যাখান করিলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা বর্ষণ করিয়া জাপানের দুইটি সহর হিরোসিমা এবং নাগাসাকি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল। বিধ্বস্ত জাপান ১৯৪৫ খৃঃ ১৪ই আগস্ট আত্মসমর্পণ করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইল।

জাপানের আত্মসমর্পণ

শান্তি স্থাপনের সমস্যা ঃ বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধের ফলে কোন শান্তি সম্মেলন বা জাপান ও জার্মানীর সহিত কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল না। ধাপে ধাপে এবং ক্রমান্বয়ে সমস্যাগুলি সমাধানের সিদ্ধান্ত করা হইল। ১৯৪৭ খৃঃ ইটালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইটালী আফ্রিকার উপনিবেশগুলি পরিত্যাগ করিল এবং ইউরোপে একাধিক অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইথিওপিয়া এবং আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। ইটালীর সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার করা হইল এবং ইটালী প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। রুমানিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ড বিভিন্ন অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যসীমা অক্ষুন্ন রহিল।

বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধ

পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সহিত সন্ধি

১৯৪৫ খৃঃ ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্র রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। জার্মানীকে রাশিয়া, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের অধীনে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। ফ্রান্সের অধীনে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব করা হয়। যুদ্ধের পর ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী মিত্রপক্ষ জার্মানী অধিকার করে। বিভিন্ন অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সৈন্য রহিল। জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নুরেমবার্গে

সামরিক আদালত স্থাপন করা হইল। নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ ও নাৎসী দার্শনিক রোজেনবার্গ সহ দশজন নাৎসী নেতাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। জার্মানীর সামরিক শক্তি বিনষ্ট করা হইল। কিন্তু জার্মানীর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের প্রশ্ন লইয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ফলে পাশ্চাত্য শক্তি প্রভাবিত পশ্চিম জার্মানী এবং রাশিয়া প্রভাবিত পূর্ব জার্মানী এই দুই স্বাধীন জার্মান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইল। পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী হইল বন এবং পূর্ব জার্মানীর রাজধানী হইল রুশ অধিকৃত বার্লিন। বার্লিন লইয়া রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার তীব্র বিরোধ আরম্ভ হইল।

জার্মানী সম্পর্কে ব্যবস্থা

আমেরিকার সেনাপতি ম্যাকআর্থার জাপানের সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনীর শক্তি বিনষ্ট করিলেন। জাপানের শাসন ব্যবস্থাও পরিবর্তন করা হইল। তোজো প্রমুখ নেতাদের যুদ্ধাপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। জাপানে আমেরিকার আধিপত্য স্থাপিত হইল। ১৯৫১ খৃঃ জাপানের সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রাশিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই।

জাপানে আমেরিকার আধিপত্য

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ : ১৯৪৬ খৃঃ সমুদ্র বক্ষে এক জাহাজে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মধ্যে আলোচনার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪২ খৃঃ ছাব্বিশটি রাষ্ট্র এক ঘোষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে। অতঃপর ১৯৪৩ খৃঃ একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। ১৯৪৪ এই চতুঃশক্তির প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের ভিত্তি হিসাবে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সানফ্রান্সিকো শহরে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ গ্রহণ করে। এইভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হইল। (United Nations Organisation)।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ছয়টি প্রধান বিভাগ আছে। (১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অছি পরিষদ, (৪) আন্তর্জাতিক বিচারালয়,

(৫) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিষদ, (৬) কেন্দ্রীয় কার্যালয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের একজন সেক্রেটারী জেনারেল আছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও কতকগুলি শাখা পরিষদ আছে।

সানফ্রান্সিকো সম্মেলনে যে সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সেই রাষ্ট্রগুলি প্রথমেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হইল। সকল স্বাধীন রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইল। সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ পরিষদ গঠিত। কিন্তু মাত্র পাঁচজন স্থায়ী এবং ছয়জন অস্থায়ী প্রতিনিধি লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, ছয়জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের হস্তে ভেটো ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে কোন একটি স্থায়ী সদস্যের বিরুদ্ধ ভোটে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল হইয়া যাইতে পারে। সুতরং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে ভেটো ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত হয় নাই। যে কোন বৃহৎ রাষ্ট্র তাহার স্বার্থ বিরোধী কোন প্রস্তাব ভেটো প্রয়োগ করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। লীগ অব নেশনস্ অপেক্ষা উন্নত প্রতিষ্ঠান হইলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থজড়িত সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জ সফল হয় নাই। তথাপি রাষ্ট্রপুঞ্জ একাধিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ইরাণ হইতে রুশ সৈন্য অপসারণে, সিরিয়া ও লেবানন হইতে ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণে, ইন্দোনেশিয়া সমস্যা এবং সুয়েজ সমস্যা সমাধানে সফল হইয়াছে। মধ্য প্রাচ্যে প্যালেষ্টাইন সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হইলেও সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হইলেও সমস্যার সমধান হয় নাই বা কোরিয়ার ঐক্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আজও হয় নাই। দুইটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ নয়। তবুও প্রতিটি রাষ্ট্রই রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের বহু উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে।

গঠন

কার্যাবলী

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটি হইল সোভিয়েত শিবির এবং অপরটি হইল ইঙ্গ-আমেরিকা শিবির। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। উভয়ের মধ্যে মারণাস্ত্র নির্মানের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্মানী বিভক্ত হইয়া দুইটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিগুলি প্রভাবিত পশ্চিম জার্মানী এবং রুশ প্রভাবিত পূর্ব জার্মানী। বার্লিন সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক সমস্যা।

দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবির

আফ্রিকা এবং এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শোষনের অবসান ঘটিতেছে। ১৯৪৭ খৃঃ ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তান নামে আর একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোচীন বিভক্ত হইয়া দুইটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। কাম্বোডিয়া এবং লাওসও আজ স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৪৮ খৃঃ ব্রহ্ম স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মালয় এবং সিংহলও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরও ধাপে ধাপে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভারত, পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল চীন বিপ্লব। বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব হইতেই চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিণ্টাং সরকারের সহিত কম্যুনিষ্ট দলের তীব্র সংঘর্ষ চলিতেছিল। যুদ্ধের পর এই সংঘর্ষ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। কুমোমিণ্টাং দলের মধ্যে দুর্নীতি এবং অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে কুয়োমিণ্টাং দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইয়াছিল। মাও সে তুং, চু তে, চু-এন-লাই প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হইয়াছিল। ইহাদের নেতৃত্বে

চীন বিপ্লব

মুক্তি ফৌজ দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে চিয়াং কাইশেককে পরাজিত করিয়া চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিল। চিয়াং ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমেরিকার সমর্থনে ফরমোজা দ্বীপে চিয়াংএর শাসন এখনও বজায় রহিয়াছে। ১৯৪৯ খৃঃ ১লা অক্টোবর পিকিংএ নূতন চীনা প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। মাও-সে-তুং রাষ্ট্রপতি এবং চৌ-এন-লাই প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। অতি সম্প্রতি মাও পদত্যাগ করিয়াছেন। লী-শাও-চি নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আমেরিকার বিরোধিতার ফলে নূতন চীন এখনও রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে নাই। ১৯৫৪ খৃঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ-এন-লাই আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচদফা নীতি বা পঞ্চশীল ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু অতি সম্প্রতি চীনের উগ্র পররাষ্ট্র-নীতি ভারত সহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভীতি এবং আশংকার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় নাই।

মাও সে তুং

আফ্রিকার উপনিবেশগুলি এবং আরব দেশগুলিও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েল জন্মলাভ করিয়াছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের আজ আরব জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ নেতা। মিশর ও সিরিয়া মিলিত হইয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করিয়াছে। ১৯৫৬ খৃঃ রাষ্ট্রপতি নাসের ইংরেজ ও ফরাসীদের হাত হইতে সুয়েজখাল জাতীয়করণ করিয়া লইয়াছেন। ইংরেজ ও ফরাসী সরকার ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া মিশর আক্রমণ করে। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান

হইয়াছে। জেনারেল কাশেমের নেতৃত্বে ইরাকে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

নবজাগ্রত আফ্রিকা

লেবানন পূর্বেই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল। সুদান, তিউনিসিয়া, লিবিয়া এবং মরোক্কো স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৫৮ খৃঃ গোল্ড কোষ্ট স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ইহার নাম হইয়াছে ঘানা। ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা। ক্ষুদ্র গিনিও ঐবৎসর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৫৯ খৃঃ ক্যামেরুন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৬০ খৃঃ মালি, মালাগাসি, কঙ্গো, ব্রিটিশ ও ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছে, এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করিতেছে। অন্ধকার আফ্রিকার ঘুম ভাঙ্গিতেছে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতেছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার ইতিহাসে নূতন ও গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

১৯৩৯ জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯৪৪ ইটালীর আত্মসর্পণ।
১৯৪৫ জার্মানী ও জাপানের আত্মসমর্পণ। যুদ্ধের অবসান।
১৯৪৫ রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৭ ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ।
১৯৪৮ ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ।
১৯৪৯ চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৭-৬০ এশিয়া ও আফ্রিকার একাধিক দেশের স্বাধীনতা লাভ।

প্রশ্নাবলী

1. Briefly describe the causes and course of the Second world war.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ এবং গতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
2. Write what you know about U. N. O.
রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
3. Briefly discuss the political changes and International situation after the Second world war.
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিশ্বপরিস্থিতি আলোচনা কর।